আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার দ্বিসপ্ততিতম গ্রন্থ

জীবন সঙ্গিনী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাঘ—১৩২৮
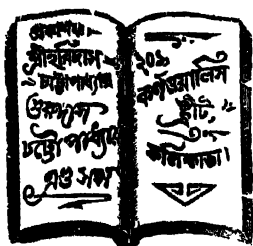
প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

জীবন সঙ্গিনী

১

শশীবাবু মুখ হইতে গড়গড়ার নলটা নামাইয়া কহিলেন— "সে যত টাকাই হোক আমি এই ছেলেকেই চাই।" নীলমণি ঘটক স্বার্থসিদ্ধির পথটুকু এত সহজে পূর্ণ হইতে চলিল দেখিয়া, মুখ খানা নীচু করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—'আজ্ঞে, তা-এত আপনার উপযুক্ত কথা। হতভাগারা বোঝেনা যে নন্দপুরের চৌধুরীদের ঘরে সম্বন্ধ করা জোর কপালের কাজ।' "দেখ নীলমণি, এঘরে বাঙ্গালা দেশের কোন্ কুলীন না বাঁধা আছেন? জনাইয়ের মুখুয্যের ছেলে, তার এত অহঙ্কার! দেখ ওঘরের ছেলে আমি একজন চাই-ই চাই। তা যত টাকাই লাগুক না কেন। তুমি আবার যাও, আজই রওয়ানা হও—শুধু মুখের কথা শুন্‌তে আমি চাই না, একেবারে কাজ হাঁসিল ক'রে এস।"

নীলমণি ঘটক উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—"আপনার অনুমতি হ'লে কোন্ কাজ না কর্‌তে পারি। তবে আপনার মেয়ের উপযুক্ত বরও ত হওয়া চাই। জনাইয়ের শ্যামাচরণ মুখুয্যের ছেলেটী মন্দ নয়, দু'টো পাশও দিয়েছে। দেখ্‌তে শুন্‌তেও মন্দ নয়—তবে ঐ ত বল্লুম, শ্যামাচরণ মুখুয্যের বড়

দেমাক, আমায় একেবারে তাড়িয়ে দিলে,—বলে কি না কিছুতেই নন্দপুরের চৌধুরীদের ঘরে, ছেলের বিয়ে দেবো না। আরও কত কি যে বল্লে, সে সব কথা ত কর্ত্তা আপনাকে বল্‌তে জিহ্বা দিয়া বের হবে না। তাই আমার ইচ্ছে, যে ক'রেই হোক্, ঐ শ্যামাচরণের ছেলের সঙ্গেই খুকিদিদির বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। নইলে বড়ই অপমানের কথা হবে।"

শশীবাবু গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন—'দেখ নীলমণি, তুমি ত জান আমার প্রকৃতি, যখন যে কাজে বাধা পাই, সেকাজ কর্‌তেই আমার মনের জেদ আরও বেড়ে উঠে। বেশ ত, শ্যামাচরণ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে ফেল। টাকা—টাকার জন্য ভেব না।'

নীলমণি ঘটকের মুখের উপর প্রফুল্লতার উজ্জ্বল শ্রী ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল—'আজ্ঞে, তা হ'লে বেটাকে একবার নন্দপুরে এনে ঘানিগাছে ঘুরিয়ে তবে ছেড়ে দিতে পারি, কত বড় অহঙ্কারী সে, একবার দেখে নেওয়া যায়।'

'তা বেশ ত, আজই যাও। দপ্তর থেকে খরচের টাকাটা চেয়ে নিয়ে যেও,—হাঁ হে তোমার কত টাকা লাগ্‌বে?'

'আজ্ঞে রাজবাড়ীর ঘটক আমি, মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ত, শ'তিন চার হলেই হবে।'

'যাক্, তুমি পাঁচশো টাকা নিয়ে যাও। দু'শো টাকা বাড়ীতে রেখে যেও। ভায়া, দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রেছ, একটু খরচের দরকার ত!'

নীলমণি কহিল—'আপনার এ গরীবের প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ।'

শশীবাবু ইতিমধ্যে একখানা কাগজে টাকা দেওয়ার আদেশ-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন—"নীলমণি তুমি এই রোকাখানা দপ্তরে দিয়ে টাকা নিয়ে যেও। আজই যাওয়া চাই, বুঝ্‌লে। আমি এখন উঠ্‌বো, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উপস্থিত।" এই কথা বলিয়া শশীবাবু ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। নীলমণি ঘটক হাসিমুখে দপ্তরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই সুযোগে আমরা ইঁহাদের একটু পরিচয় দিয়া লই। শশিকান্ত চৌধুরী নন্দপুরের জমিদার। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী শ্রেণী। বহুদিনের পুরাণো জমিদার। বরিশাল জেলায় ইঁহারা খুব বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার—দেশের সর্ব্বত্রই ইঁহাদের সুনাম ও যশ। বারমাসের তের পার্ব্বণের সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রায় ও দোলযাত্রায় নন্দপুরে খুব ধূমধাম হয়। বহুস্থানের পুরুষ ও নারী দলে দলে আসিয়া মেলা দেখিয়া যায়। এ সময়ে জমিদারী সরকারেও বেশ দু'পয়সা লাভ হয়। শশী চৌধুরী নামে ভাল জমিদার। বাহিরে ইঁহার খুব নাম। প্রজারাও চৌধুরী মহাশয়ের নামে কাঁপিতে থাকে। একটী পয়সা বকেয়া খাজানা ফেলিয়া রাখিবার সাধ্য তাহার জমিদারীর কোন প্রজারই ছিল না। মনিবের কড়া হুকুমে—নায়েব, তহশীলদাররাও প্রজার প্রতি অত্যাচারে অদ্বিতীয় ছিল। এককথায় এমন

অত্যাচারী, কৃপণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির জমিদার সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। এদিকে চৌধুরী মহাশয় কৌশলী ও চতুর লোক ছিলেন। গভর্মেণ্টের নিকট তিনি নিরীহ মেষশাবকটির মত অনুগত ও বাধ্য থাকিতেন। জেলার কালেক্টার বা মহকুমার হাকিম যখন যে বিষয়ে চাঁদা চাহিতেন, শশীবাবু তখনি তাহা অম্লানবদনে পাঠাইয়া দিতেন—যে কোনও রাজকর্ম্মচারী তাঁহার বাড়ীতে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে আসিত, তাহাকেই তিনি পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন, কাজেই কি পুলিশ কর্ম্মচারী, কি আব্কারী বিভাগের লোক, কি ইন্‌কমটেক্সের দারোগা, কি আদালতের আম্‌লা সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিত—তাঁহার শত অত্যাচার ও অবিচারের বিষয় বাহিরে কোনরূপেই প্রকাশ পাইত না।

ধার্ম্মিক ও সদাচারী বলিয়াও তাঁহার বাহিরে যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনবেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক, হোম, যাগ যজ্ঞ উপবাস এ সকল কোন না কোন্ ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিমাসে লাগিয়াই থাকিত। বাইরে নানা দিক্ দিয়া নানাজনের মুখে সুনাম ও সুখ্যাতি প্রচারিত হইলেও ভিতরের মানুষটি যে কত বড় হীন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন, সে সকল কথা পরে বলিব। চৌধুরী মহাশয় দেখিতে বেঁটে, স্থূলকায় ও শ্যামবর্ণের পুরুষ। চক্ষু দুইটী বৃহৎ ও স্বাভাবিক একটু লাল, নাসিকাটি দিব্যি সরু, মাথায় খানিকটা জুড়িয়া একটী অনতিবৃহৎ টাক, টাকের পশ্চাতে একটী টিকি, টিকিটি বেশ বড়। চৌধুরী মহাশয় গ্রামের বাহিরে যাইতে বড় একটা

পছন্দ করিতেন না। আজকাল যেমন অধিকাংশ মফঃস্বলের জমিদাররাই সহরে বাস আরম্ভ করিয়াছেন, চৌধুরী মহাশয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বরং গ্রাম হইতে কোন দিন জেলায় যাইতে হইলেই প্রমাদ গণিতেন। চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যিনি জমিদার-গৃহিণী তিনি ষোড়শী যুবতী—পরম রূপবতী। শশীবাবুর বয়স পঞ্চান্ন বৎসরের ন্যূন হইবে না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রথমে তিনি বিবাহ করিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদার মহাশয়ের হিতৈষী বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন যে—"সোণার সংসার কি লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে? তারপর 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' গৃহিণী ব্যতীত ঘর-সংসার সকলই বৃথা। এই অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ-পরিবার যদি রমণীর কলহাস্যে মুখরিত না হইয়া উঠে, তাহা হইলে সকলই বৃথা— তাঁহার ন্যায় রূপবান্ ও ধনবান্ জমিদারের পক্ষে এরূপ নিঃসঙ্গ-জীবন অতিবাহিত করিলে যে, কমলা রুষ্টা হইবেন।" এরূপ হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ উপেক্ষা করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন— বিবাহ হইয়াছে আজ দুইবৎসর। এখন পত্নী মাধুরীদেবী গৃহকর্ত্রী—গৃহনেত্রী এবং চৌধুরী মহাশয়ের জীবনের ধ্রুবতারা।

চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলকুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্, এ, পড়িতেছে। কনিষ্ঠ সুনীলকুমার

দশমবর্ষীয় বালক, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ক্লাস থ্রিতে অধ্যয়ন করে। কন্যা নিরুপমা এই চৌদ্দ বৎসরে পা দিয়াছে। নিরুপমা সত্য সত্যই নিরুপমা—এমন নিখুঁত সুন্দরী বাঙ্গালী পরিবারে অতি কমই দেখা যায়। চৌধুরী মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ভয়ানক বিদ্বেষী হইলেও অনিলকুমারের প্ররোচনায় কন্যা নিরুপমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ভূপতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে গ্রামের বি, এ, উপাধিধারী একটী সুশিক্ষিত দরিদ্র যুবকের উপর কন্যার শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। এ নির্ব্বাচন অনিলের, নচেৎ চৌধুরী মহাশয় যে একজন যুবককে কন্যার শিক্ষকের পদে নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহা ছিল অসম্ভব। ভূপতি ও অনিল একসঙ্গেই বাল্যকাল হইতে পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছে। দুইজনে একসঙ্গেই বি. এ, পাশ করিয়াছে। ভূপতি দরিদ্র, তাই আর পড়াশুনা করিতে পারে নাই। এখন সে গ্রাম্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও নিরুপমার গৃহ-শিক্ষক। ভূপতি বিবাহিত—বি, এ, পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই তাহার বিবাহ হয়। দরিদ্রের সংসার—বৃহৎ পরিবার। স্কুলের বেতন ৮০৲ আশীটাকা ও নিরুপমার শিক্ষকরূপে বেতন ২০৲ কুড়িটি টাকা, মোট ১০০৲ একশত টাকায় ভূপতিনাথকে বৃহৎ সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। ভূপতিনাথের বয়স ছাব্বিশের কাছাকাছি—অতি সুশ্রী, বলিষ্ঠ যুবক। গ্রামে চরিত্রবান্ বলিয়া তাহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইংরেজী ও

বাঙ্গালায় বক্তৃতা করাও তাহার অভ্যাস ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে তাহার গদ্য ও পদ্য লেখা প্রকাশ হইত। ভূপতির শিক্ষাধানে নিরুপমা দিন দিন স্কুলে পড়া মেয়েদের চেয়েও ঢের বেশী শিখিয়াছিল। অনিল ও ভূপতি ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। অনিলের ইচ্ছা ছিল যে, ভূপতির ন্যায় চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত যুবকের সঙ্গেই নিরুপমার বিবাহ হয়। কিন্তু তাহার কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিল না—সে ছিল ভঙ্গকুলীন—বিশেষ দরিদ্র; যে পরিবারে কোন দিন শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্যতীত অপরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই—সেই পরিবারে এইরূপ একটা অস্বাভাবিক মর্য্যাদাহানিকর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চৌধুরী মহাশয় কোন মতেই স্বীকৃত হন নাই, কাজেই অনলের প্রস্তাবানুসারে কাজ হয় নাই। দরিদ্র ভূপতির পিতা মাতা একজন ময়মনসিংহের ধনী তালুকদারের কুৎসিতা কন্যার সহিত প্রচুর অর্থ লইয়া ভূপতির শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ দিয়াছিলেন। ভূপতি বিবাহ করিয়া সুখী হয় নাই—তাহার পত্নী সুবালা কুৎসিতা হইলেও সুশিক্ষিতা, গুণবতী ও মধুর স্বভাবের তরুণী—সে অল্প দিনের মধ্যেই শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া—গৃহকার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া স্বামীর সর্ব্ববিধ সুখসুবিধার দিকে মনোযোগী হইয়া—গ্রামের অতি বড় নিন্দাপ্রিয় পুরমহিলাগণের নিকট হইতেও সুখ্যাতি এবং সুনাম লাভ করিয়াছিল। ইদানীং নিরুপমার বিবাহের পাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ব্যবস্থা

চলিতেছিল। অনেক স্থান হইতেই প্রস্তাব আসিয়াছিল,—জমিদার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। নানাদিকের কোন সম্বন্ধই চৌধুরী মহাশয়ের মনঃপুত হইতেছিল না। শেষটায় হুগলী জেলার জনাইয়ের পরম কুলীন মুখোপাধ্যায়বংশীয় একটী ছেলের সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতেছিল। পাত্র পক্ষ বাঙ্গালাদেশের জমিদার কন্যার সহিত অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ না করিয়া কোন মতেই পুত্রের বিবাহ দিতে রাজি হইতেছিলেন না। যতই পাত্রপক্ষ হইতে বাধা আসিতেছিল চৌধুরী মহাশয়ও তত বেশী সেদিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। যত টাকা লাগে—সে পাত্র চাই-ই চাই। নীলমণি ঘটক এই আদেশ লইয়া পাত্র-নির্ব্বাচনে হুগলী রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২

শরতের অপরাহ্ণ। শারদীয় উৎসবের আর অতি অল্প দিন বাকী। দেশে একটা নূতন জোয়ার আসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী মহারাজার অসহযোগ আন্দোলনের কথা শুধু দেশের ব্যবসায়ী পলিটিসিয়ানদিগকেই এবার নাড়াচাড়া দেয় নাই, এবার তাহা কৃষকের ঘরের ছাউনি ঘেরা কুটীরের মাঝেও উঁকি দিয়াছে। বন্যা যখন আসে সে যেমন তখন কোন বাধাই মানিতে চাহে না, তেমনি এই যে পুণ্যপ্লাবনের মন্দাকিনী ধারা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে তাহার স্রোত রোধ করা কি বড়

একটা সহজ কথা? বিকেল বেলা—শরতের সোণালি রৌদ্র নারিকেল গাছের পাতার আড়াল দিয়া চারিদিকে সোণা ছড়াইয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিতেছে। শেফালি গাছে প্রচুর ফুল ফুটিয়া গাছের তলায় পুষ্প শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। একটী আঁকা বাঁকা খালের ধারে ভূপতিদের বাড়ী। বাড়ী খানি অনেকটা যায়গা লইয়া অবস্থিত। সুপারি ও নারিকেল গাছের ঘন সারির মধ্যে বাড়ী খানা অবস্থিত। বাহির বাড়ীতে এক খানা ছোট খড়ের ঘর, এই ঘরখানাই ভূপতিদের বৈঠক-খানা বা পড়িবার ও বসিবার ঘর। ঘরের মধ্যে আসবাবের মধ্যে একখানা জীর্ণ টেবিল, কেরোসিনের কাঠের তৈরী একটী আলমারি। আলমারির মধ্যে নানা শ্রেণীর বহি স্তরে স্তরে সাজান। একপাশে একখানা অর্দ্ধভগ্ন তক্তপোষের উপর একখানা অর্দ্ধছিন্ন সতরঞ্চ একটী তাকিয়া শোভা করিয়া আছে। তক্তপোষের চারিধারে বহি ছড়ান। ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ দোয়াত কলম। কোন জিনিষেরই কোন একটা শৃঙ্খলা নাই। বাড়ীর ভিতর চারিখানা ঘর। সব কয়খানিই টিনের ছাউনি। পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ ঘর গৃহস্থের বাড়ী যেমন হয় এও তেমনি।

দিনের কাজ সারিয়া সুবালা চরকায় সূতা কাটিতেছিল। সুবালার পাশে একবৎসরের খোকা বাম হাতের মুঠি খানি মুখের ভিতর দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সুবালার হাত দ্রুত চরকার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল—আর সূতা পুঞ্জীভূত

হইতেছিল। সুবালা কৃষ্ণকায়—তবু চরিত্র মাধুর্য্যের মনোহর সৌন্দর্য্য তাহার সারা মুখখানি ব্যাপিয়া এক মধুর শোভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে যে তরঙ্গ প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—এ ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র কুটীরে কুটীরেও তাহার জাগরণ শুধু বাক্যেই অপসারিত হয় নাই, কার্য্যেও তাহা সুস্পষ্ট-ভাবে দেশজননীর সেবার জন্য ভক্তি-অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতেছিল। সুবালা স্বামীর কাছে দেশের কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসিত। যেদিন সে শুনিল বিদেশী বস্ত্রব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেদিন স্কুলের ছুটির পর ভূপতি বাড়ী আসিলে সে তাহাকে বলিল 'দেখ, আজ থেকে আমি আর বিলাতি কাপড় পরব না।'

ভূপতি হাসিয়া কহিল 'গান্ধিজীর পরম সৌভাগ্য যে অন্তঃপুরেও তোমার মত একজন দেশহিতৈষিণী জুটেছে।'

স্বামীর এই কৌতুক-রহস্যে সে পরম তৃপ্তির সহিত কহিল, 'তোমরা কি আমাদিগকে এতই তুচ্ছ মনে কর! আমরা কি সংসারের একটা বোঝা মাত্র! দেশ কি কেবল পুরুষদের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, নারী কি তাহাদের কিছুই নহে?'

ভূপতি কখন কল্পনাও করিতে পারে না যে, এই অশিক্ষিতা রমণী এমন করিয়া দেশকে ভালবাসিতে পারে, তাই সে আনন্দিত হইয়া কহিল, 'দেখ, দেশ সকলেরই। কিন্তু একটা কথা সুবালা, মহাত্মাজীর আদেশ কি জান?'

সুবালা অনুযোগের সুরে কহিল, 'তুমি কি আমাকে সব কথা বল ?'

'কেন বলিনা, সে দোষ আমাদের নয়—তোমাদের, তোমাদের কাছে কোন গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলেও ত তোমরা তাহা বুঝিতে পার না। সে শিক্ষা তোমাদের নাই, তাই অনেক কথা বলিতে যাইয়াও ক্ষান্ত হই।'

সুবালা মলিন মুখে বলিল, 'দোষ আমাদের ? মিথ্যা কথা! আমরা হিন্দুঘরের মেয়ে, যে বয়সে আমাদের বিবাহ হয়, সে বয়সে আমরা ত শিক্ষার অনুপযুক্ত থাকি না, কিন্তু তোমরা আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার মত চেষ্টা ও যত্ন ত এক দিনের জন্যও কর না। আমাদের মনে কর শুধু বিলাস-ভোগের সামগ্রী আর—আর কিছু না।'

ভূপতির মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। একথা কি সত্য নয় ? এ দোষ কি তাহাদের নয়। ধীরে ধীরে নারী-শক্তি দেশে জাগরিত হইতেছে। এ জাগরণ বক্তৃতায় হয় নাই—কতিপয় শিক্ষিতা মহিলার কলিকাতায় সভা করিয়া বারিবর্ষণ হীন গভীর নির্ঘোষে হয় নাই। এ শক্তি জাগিয়াছে—বাহিরের আলোক তরঙ্গের ধীরে ধীরে আত্মশক্তি বিকাশের ফলে। সুবালার কথায় ভূপতি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কহিল 'তুমি তবে কি কর্‌তে চাও সুবালা ?'

'তুমিই বল না, আমি কি কর্‌তে পারি ?'

'সংসারের সব কাজ কর্ম্ম সেরে তোমার অবসর কোথায় সুবালা যে তুমি দেশের কথা ভাব্‌বে!'

'দেখ, যে কায করে, তার কথনও সময়ের অভাব হয় না, কিন্তু যারা কায জানে না তা'দেরই সময়ের অভাব হয়। তুমি আমাকে আদেশ কর, উপদেশ দাও, আমি সংসারের সব কায সেরেও দেশের কল্যাণের জন্য যতটুকু পারি খাট্‌বো। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আকাশে জ্বলে ব'লে কি জোনাকি তার তুচ্ছ আলোক-কণিকাটুকু নিয়ে পৃথিবীর বুকে বেঁচে নাই।'

সেদিন এই তর্কবিতর্কের পর হইতেই ভূপতি সুবালার জন্য একটী চরকা আনিয়া দিয়াছেন, সুবালা যখনই গৃহকার্য্যের ব্যস্ততার মাঝখানে ক্ষণিক একটু অবসর পাইত তখনই চরকা লইয়া সূতা কাটিতে বসিয়া যাইত। এই ভাবে সে তিন মাসের মধ্যে তাহার ও স্বামীর পরিধানের উপাযোগী একযোড়া কাপড় তৈরী করিতে পারিয়াছে। পাড়ার তাঁতীরা তাহার তৈরী সূতা বেশ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে চাহে।

আজ বিকেল বেলা চরকা কাটিতে কাটিতে সে ভাবিতেছিল 'এমন দেব-দুর্লভ স্বামী আমার, আর আমি কত কুৎসিতা—কিসে তার যোগ্য, না না কোনমতেইত না। তিনি আমায় কেমন করিয়া ভালবাসিতে পারেন?—আমি দাসী—শুধু এই বর দাও বিধাতা, যেন তাঁহার সেবা করিয়াই এই জীবনটা শেষ করিয়া দিতে পারি।' স্ত্রী স্বামীর মন যত সহজে বুঝিতে পারে, বোধ হয় স্বামী তত সহজে তাহা পারে না। ভূপতি কর্ত্তব্যের

দায়িত্বটুকু মাথায় লইয়া সুবালার প্রতি যে স্নেহ ও প্রীতির ভাব প্রদর্শন করিত, তাহার মধ্যে যে প্রাণের কোনও গভীর আকর্ষণ ছিল না, তাহা বুদ্ধিমতী সুবালার বুঝিতে বাকী ছিল না, কিন্তু সে কোন দিন এই অলক্ষিত নিগ্রহটুকু অন্তরে উপলব্ধি করিয়াও বাহিরে এক দিনের জন্যও তাহা প্রকাশ করে নাই—করিবার ত কোন প্রয়োজন নাই; সে যে সেবিকা, তার যে কর্ত্তব্য শুধু সেবা—স্নেহ ও প্রীতি। ফল্গুর বুকের ধারা যেমন কোনদিন বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে না, তেমনি তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি সেবা ও যত্নের পুণ্যধারা বুকে লইয়া সংসারের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সেদিন সে সূতা কাটিতেছে, এরূপ সময় তাহার প্রৌঢ়া শাশুড়ী তাহার কাছে আসিয়া একখানা পিঁড়ির উপর বসিয়া কহিলেন 'শুনেছিস্ বৌমা?'

সুবালা ঔৎসুক্য সহকারে কহিল 'কি মা?'

'শুনিসুনি—জমিদারের মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে যে নীলু ঘটক কাল ফিরে এসেছে।"

চরকার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া সুবালা কহিল—'বিয়ের দিন কি ঠিক্ হয়েছে?'

'তা শুনিনি—শুনলুম ছেলে নাকি খুব বড় কুলীন, বাপও বড় লোক—উকিল, একদিন ত এই মেয়ের সঙ্গে আমার ভূপতির বিয়ে দেওয়ার জন্য জমিদারের ছেলে অনিল উঠে পড়ে লেগেছিল, তা ত আর হ'লনা!'

সুবালা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'কেন হ'ল না মা?'

'আমরা যে ভঙ্গ, আর ওঁরা চান নিকষ কুলীন, দুনিয়ার বাছা বংশ, তা না হ'য়ে ভালই হ'য়েছে!'

সুবালা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—'তাহ'লে কিন্তু বেশ হ'ত মা, ওঁকেও আর দিনরাত এত খাটতে হ'ত না, এত অভাব অভি-যোগও থাক্‌তনা, বউও মনের মত পেতে মা, সব দিকেই বেশ হ'ত—কেমন নয়?'

শ্বাশুড়ী সারদাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন—'দূর আবাগীর বেটী! অত বাজে বকিস্‌নে, তোর মত বউ পেয়েছি তাই রক্ষে!'

সুবালার অজ্ঞাত ছিল না যে, এই শ্বাশুড়ী তাহাকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাই সে হাসিয়া কহিল—'তাত বটেই, এমন কাল পেঁচা জুট্‌বে কোত্থেকে?'

'কাল পেঁচাই যে মা আমার লক্ষ্মীর বাহন। তুই যেমন কর্ত্তার ও আমার সেবা করিস্—ঘর-সংসার দেখিস্, জমিদারের মেয়ে কি আর সে দিকে ফিরে চাইত?'

'তখন ত মা আর কোন অভাব রইত না, দাসদাসী আস্‌ত, দালান বাড়ী হ'তে—একেবারে অমরাপুরী হয়ে যেত! কি বল মা?'

'চুপ কর পাগ্‌লি, সে সব বাজে কথা ব'লে আর কি লাভ? ভগবান মঙ্গলময় জানিস্ ত. তিনি বুঝে সুজেই গরীবের ঘরে মানাবার মত বৌ এনে দিয়েছেন। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে এখন, চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর রাখ্।'

'মা, তুমি একদিন না চরকার গল্প বল্‌বে বলেছিলে ? কেমন ক'রে ছেলে বেলা চরকা ঘুরাতে, সে সব কথা একবার বলো মা !'

'সে আর একদিন বল্‌বো। আজ কর্ত্তার আবার বাতের ব্যারামটা বেড়েছে, এদিকে খোকা আপনার মনে খেলিতে খেলিতে কখন যে মাটির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে দিকে শ্বাশুড়ী বৌয়ের কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। সারদাসুন্দরী হঠাৎ খোকাকে মাটিতে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন—'কালই আমি তোর চরকা ভেঙ্গে দেব, দুষ্টু মেয়ে একবার সোনার চাঁদকে দেখ্‌বার অবসর পাওনি ? এই ভিজা মাটিতে শুয়ে যে দাদুর আমার অসুখ ক'র্‌বে !' এইরূপ বলিয়া তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে লইয়া চলিয়া গেলেন। সুবালা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'হায় রূপের কাঙ্গাল পৃথিবীতে বিধাতা তাহাকে রূপহীনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন ?

৩

ম্যালেরিয়া এ দেশের যে কত সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে সে ইতিহাস জানিয়াও আমরা নীরব। সরকার বাহাদুর মোটা মাহিয়ানায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সাগর পারের বড় বড় অভিজ্ঞ ব্যক্তির আমদানি করিতেছেন, তাহারা মাসে মাসে পুঁথি ছাপে, বক্তৃতা দেয় আর সরকারের টাকার অভাবে

কিছুই হইতেছে না বা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া হা হতাশের সহিত মন্তব্য লেখেন। আর দেশের যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা দেশ ছাড়িয়া—পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া দেওঘর, গিরিডি, মধুপুরে বাড়ী তৈরী করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। শুধু দেশের গরীব দুঃখীর দল জ্বরে ভুগিয়া, অনাহার সহিয়া, অচিকিৎসায় চিতার আগুনে দেহভস্ম মিলাইয়া দেয়। অথচ আমাদের দেশ উদ্ধারের অভাব নাই, বক্তৃতার বিরাম নাই, পল্লীসংস্কারের প্রবন্ধের অভাব নাই। ম্যালেরিয়ার জ্বর জ্বালা পশ্চিম বাঙ্গালায় যত বেশী, পূর্ব্ববঙ্গে তাহার কিছুই নাই, কারণ সেখানে বর্ষায় চারিদিক জলে ভাসিয়া যায়!

হুগলী জেলায় রায়পুর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এক সময়ে উহা অবশ্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এ গ্রামে বাড়ী বাড়ী শারদীয় উৎসবে মাতা দশভুজার অর্চ্চনা হইত—আনন্দের উৎসাহধারা শতধারায় উৎসারিত হইত, এখন সে গ্রামের সে প্রসিদ্ধি কিছুই নাই। বড় বড় বাড়ী খালি পড়িয়া আছে—পথ ঘাট জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, দীঘী পুকুরের জল পানের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে—দেশে বড় একটা কেহই থাকেন না, যাঁহাদের সামান্য একটু অর্থসঙ্গতি আছে, তাঁহারা সকলেই সহরে চলিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের এক পাশে রামলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। মুখুয্যে মহাশয় শ্রেষ্ঠ কুলীন। যৌবনে আবগারী বিভাগের দারোগা

ছিলেন, গাঁজা, আফিংএর দোকান তদন্ত করিয়া তখন দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, কিন্তু চাকরী ছাড়িয়া প্যান্সন্ লইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন খতাইয়া দেখিলেন যে সঞ্চিত অর্থ কিছুই নাই, শুধু প্যান্সনের পঞ্চাশটি টাকা লইয়া তাহার শেষ দিনগুলি কাটাইয়া দিতে হইবে। তাহাও খুব আরামে যাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, কারণ আবগারী বিভাগের সংস্পর্শগুণে তাঁহার মদ ও গাঁজার প্রতি যে আসক্তি জন্মিয়াছিল, এখনও তাহার আকর্ষণ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে দারোগাবাবুর তুষ্টির জন্য লাইসেন্সধারীরা বিনা পয়সায় মদ ও গাঁজা জোগাইত, কাজেই তাহার অভ্যাসটাও সীমা ছাড়িয়া একটু অতিরিক্ত রকমের হইয়া পড়িয়াছিল— অবসর পাইয়া বহুদিনের সেই অভ্যাসটা তাঁহাকে নাগ-পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পরিবারটি তেমন বৃহৎ নহে। প্রৌঢ়া গৃহিণী ও দুইটী পুত্রসন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ হুগলী কালেজে বি, এ পড়িতেছিল, কিন্তু আজ দুই বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার শরীর একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সপ্তাহে সে দুই তিন দিনের বেশী ভাল থাকে না। অর্থের অনাটনে তাহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও পাঠাইবার ব্যবস্থাও অসম্ভব। সুবোধ বাড়ীতে থাকিয়াই ম্যালেরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কনিষ্ঠ প্রবোধ পনের বৎসরের বালক—গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, ছেলেটিও দাদারই মত রোগা—পড়াশুনায়

ভাল। গৃহিণী রামলক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি কঙ্কালসার। বয়স পঞ্চাশের অনধিক হইলেও তাহাকে প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীনার ন্যায় দেখাইত। শুধু মুখুয্যে মহাশয়ই ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই করিয়া সুস্থ সবল দেহে বিরাজ করিতে ছিলেন—বোধ হয় সেটা গাঁজা ও মদের গুণ। মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীখানি এক সময়ে বেশ ভাল ছিল। দু'খানা একতালা দালান—চণ্ডীমণ্ডপের গোলপাতা ছাওয়া জীর্ণ গৃহখানি—আর কয়েক বিঘা পতিত জমি লইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীখানা গ্রামের এক প্রান্তে শোভা পাইত। এক কার্ত্তিকের সন্ধ্যায় রামলক্ষ্মী দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এই ভাবে ত আর দিন চলে না,—আর এ দেশেও ত থাকা চলে না, যা হয় একটা বিলি ব্যবস্থা কর।'

মুখুয্যে মহাশয় গাঁজার কল্কী হইতে প্রচুর ধূমোদ্গীরণ করিয়া বলিতেন—'সে ভাবনা ভাব্‌বার কোনো দরকার নাই গিন্নি, সুবোধ প্রবোধ বেঁচে থাক্‌লে আর কোন দুঃখু নেই।'

'বলি, যে রকম জ্বরে ব্যারামে ভুগ্‌ছে আর যে পোড়া দেশ, এদেশে থাক্‌লে কি আর বাছারা বাঁচ্‌বে? তুমি যে কি ছাই বুঝেছ তা তুমিই জান, বলি এখনও এস, সময় থাক্‌তে পালাই। দেওঘরে আমার ভগ্নীপতি আছেন, তিনি বলেছিলেন যে একটু চেষ্টা যত্ন করে কুঁড়ে তুলবার মত একটু যায়গা তিনি আমাদের করে দিতে পারবেন।'

'বলি সব হবে গো! সব হবে। মা জগদম্বার কৃপা হ'লে চাকি ঘুর্‌তে কতক্ষণ। এই যে—বাঃ রে, তোমায় বল্‌তে বড় ভুল হয়ে গেছে, বরিশালের নন্দপুরের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে—বুঝ্‌লে সে শশীবাবু মস্ত বড় জমিদার—পাঁচ সাত লাক্ টাকা মুনাফা, মস্ত বড়লোক, তার মেয়ের সঙ্গে আমার সুবোধের বিয়ের প্রস্তাব চল্‌ছে—বিয়েটা হ'লেই একটা দাও মার্‌তে পার্‌বো। তোমারও দু'দশ ভরি সোণাদানা হবে, আমাদেরও অভাব ঘুচ্‌বে—এখন সম্বন্ধটা পাকাপাকি হ'য়ে গেলেই বাড়ীটা ওপাড়ার হরে বাগ্‌দীকে বন্দোবস্ত দিয়ে মধুপুরে একখানা বাড়ী কর্‌বো মনে ক'রেছি! কি বল গিন্নি?'

গৃহিণী একগাল হাসিয়া বলিলেন—'মুখে ত তুমি কত কথাই বল, কিন্তু কাজের বেলা ত কিছুই দেখ্‌তে পাই না। হ'লে ত খুবই ভাল। দেখ বেশী লোভ ক'রে যেন আবার হাত ছাড়া করো না।'

'রামচন্দ্র! আমি কি তেমন আহাম্মুক নাকি? বুঝ্‌লে যখন বরিশালে ছিলুম, তখন মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয়, অনেক দিন আগেই তিনি এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সবে তার মেয়েটী জন্মেছিল। শশীবাবু চিঠি লিখেছেন যে কথাবর্ত্তা পাকাপাকি কর্‌বার জন্য দু'চার দিনের মধ্যেই ঘটক পাঠাবেন। যা করবো—সে কি তোমার কাছে জিজ্ঞেস না করে—পরামর্শ না করে কর্‌বো? গৃহিণী আনন্দে গদ গদ হইয়া কহিলেন—'তা বেশ, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে, ক'র্‌বে,—আমার কথা এই যে

এ পাড়াগাঁয়ে এত অসুখবিসুখের ভিতর আর দেশে থাকা চলে না।'

'সেকথার কি আর ভুল আছে গিন্নি?'

এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল—'মুখুয্যেমশায় কি বাড়ী আছেন?' রামলালবাবু প্রথম বার কোন উত্তর করিলেন না, কারণ এই মৌতাতের সময়ে তিনি বাড়ী থাকেন বলিয়া সব পাওনাদারেরা তাঁহাকে তাগাদা করিতে আসিত. কাজেই এসময়ে বাহির হইতে তাহাকে কেহ বলিলে বড় একটা জবাব পাইত না, আর প্রায়শঃ কর্ত্তার হইয়া গিন্নী কিংবা প্রবোধ উত্তর দিত যে 'কর্ত্তা এখন বাড়ী নাই।' আজও বাহির হইতে আহ্বান শুনিয়া কথা কহিলেন—'ও গিন্নি! একবার বল না গা কর্ত্তা বাড়ী নেই।'

গিন্নি কোনও উত্তর দেবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার বাহির হইতে আহ্বান আসিল—'বলি মুখুয্যে মশাই কি বাড়ী আছেন?'

রামলক্ষ্মী দেবী কহিলেন—"ওগো! জবাব দাওনা, এযে অচেনা গলা, আর কথাটার ভেতরও একটু বাঙ্গালে টান আছে, ভাল করে শুনে দেখ।"

বাহিরে আহ্বান কর্ত্তা একটু অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবার একটু ক্রোধের সহিত চীৎকার করিয়া কহিলেন,—'ভাল দেশে এসেছি যাহ'ক—বলি এ বাড়ী কি রামলাল মুখুয্যের নয় নাকি?'

মুখুয্যেগৃহিণীকে কহিলেন,—'ওগো! তোমার অনুমান ঠিক্!' সোৎসাহে তিনি উত্তর দিলেন—'কে গা?'

'তবু যাহ'ক,—জবাব পেলুম, বলি একবার বাইরে আসবেন কি?'

'আপনি কে বলুন না?'

উত্তর আসিল—'আমি বরিশাল সহরের নীলমণি ঘটক।'

গৃহিণীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কর্ত্তা তক্তপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক পা চটিজুতার ভিতরে ও আর এক পায়ে খড়ম পরিয়া দ্রুত বাহিরে চলিলেন—ও চীৎকার করিয়া জবাব দিলেন—'এইযে যাচ্ছি ঘটক মশাই।' বাহিরে একটা তালগাছের মাথায় বসিয়া বৃহৎ একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল—"সিদ্ধিগুরু।"

গৃহিণী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে নানা নিরাশা ও আশার কথা ভাবিতে ভাবিতে কর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

৪

পরদিন ভোরের বেলা নীলমণি ঘটকের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। জমিদার বাবু নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিবেন এবং ছেলেকে পড়াইবার সমুদয় ব্যয়-ভার বহন করিবেন ও কলিকাতা কিংবা কলিকাতার বাহিরে কোনও স্বাস্থ্যকরস্থানে একখানা বাড়ী করিয়া দিবেন। অলঙ্কার-পত্র

যৌতুক ইত্যাদির কথা তুলিতেই ঘটক মহাশয় কহিলেন,—'বুঝ্লেন মুখুয্যে মশাই—ও সব কথা আর আপনি তুল্বেন না, রাজার মেয়ের বিয়ে হচ্চে, ওসব কথা কি আর তুল্তে হয় ?' মুখুয্যে-গৃহিণী কোন দিন এক সঙ্গে পাঁচহাজার টাকাও দেখেন নাই, কাজেই এতগুলি টাকার কথা শুনিয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, কড়া নাড়িয়া চাপা গলায় কহিলেন—'হ্যাঁগা, ঘটক মশাই বেশ যোগ্য কথাই ত বল্ছেন।' কথাবার্ত্তা লেখাপড়া স্থির হইল—ঘটক মহাশয়কে ঘটকালি বাবদ এক হাজার টাকা দিতে হইবে, এতটা টাকা দিতে মুখুয্যে মশাই অনেক আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু নীলমণি স্বর সপ্তমে চড়াইয়া যখন কহিলেন যে 'একে রাজার মেয়ে—তায় সুন্দরী, তার উপর টাকা কড়ির অভাব নাই, আপনি এ প্রস্তাবে স্বীকার না করেন, বেশ ত আমি অন্য ব্যবস্থা কচ্চি—কি বলেন, তা হ'লে এখনই উঠা যাক্, তবে কি জানেন মশাই, অনেকদিনের জানা শুনা, তাই আপনার কাছে এসেছিলুম। তারপর আপনার ছেলে কি দেখ্তে শুন্তে কি লেখাপড়ায় আর ত গুরুদাস বাড়ুয্যে নয়! একমাত্র কথা—আপনারা বড় কুলীন, তা দেশে কি এমন কুলীনের অভাব নাকি ?'

এত বড় নির্ম্মম কথার উপর প্রতিবাদ চলে না, কাজেই ঘটক মহাশয় তাহার পাওনা গণ্ডার কথাটা পাকা করিয়া লইয়া তার পর প্রয়োজনীয় লেখা-পড়া শেষ করিল। সেদিন

গ্রামের দশজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া—উলুধ্বনি করিয়া শাঁখ বাজাইয়া মিষ্টিমুখ করাইয়া মুখুয্যে মহাশয় গ্রামের সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার ছেলের সহিত পূর্ব্ব-বঙ্গের এক বড় জমিদারের মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব স্থির হইয়াছে।

এতদিন এ কথাটা কেহ বড় একটা বিশ্বাস করে নাই, এবার প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার বাড়ীতে নীলমণি ঘটককে উপস্থিত দেখিয়া সকলেই কথা যে অসত্য নহে তাহা প্রত্যয় করিয়া লইল। বলা বাহুল্য যে, যা কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তাহা ঘটক মহাশয়ের অর্থ সাহায্যেই হইয়াছিল।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ত ঘটক মহাশয় দেশের দিকে ফিরিয়া গেলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে মুখুয্যে মহাশয় যেন এদিকে সমুদয় আয়োজন স্থির করিতে থাকেন, টেলিগ্রাফ পাওয়া মাত্রই জমিদার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের দিন ঠিক্ করিয়া আসিতে হইবে ও পণের টাকাও আনিতে পারিবেন। এই ভাবে বিবাহের সব কথাই একরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল।

বিবাহের সম্বন্ধ যখন স্থির হইল—তখন কথাটা আর সুবোধের জানিতে বাকী রহিল না। সে কথা শুনিয়া জ্বরাক্রান্ত দেহে শিহরিয়া উঠিল! সত্য সত্যই কি তাহার পিতামাতা উন্মত্ত হইয়াছেন! তাহারা হইতে পারেন, কিন্তু সে ত মূর্খ নহে, আজ তিন বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শরীর যেরূপ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সে প্রতি মুহূর্ত্তে স্থির জানিয়া-

ছিল যে মরণের আর বেশী বাকী নাই। এই কঙ্কালসার রোগ জীর্ণ-দেহে তাহার কি বিবাহ বাসরের বর সাজিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে? সে লজ্জায় ও অবসাদে মরমে মরিয়া গেল। পরদিন ভোরে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে পিতার নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাহার অনভিপ্রায় জানাইবার জন্য যাইয়া উপস্থিত হইল। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াই রামলাল মুখুয্যের প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছিল—তাহার চালটা হঠাৎ নবাবি রকমের হইয়া পড়িয়াছিল মদ ও গাঁজার মাত্রাটা বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরের ঘরে চেটাইয়ের উপর পাড়ার নিধিরাম, রামহরি, কালু ও হরি বাগ্‌দী মিলিয়া গাঁজা চড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। হরি বাগ্‌দী তাহার মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি নাড়িয়া কহিল—'মহারাজ! বাবার কৃপা হলে সবই হয় জান্‌বেন, আর আমরা সবাই ত আপনার চেলা, দিনরাত আপনার মঙ্গল কামনা করি আপনার ভাল হবেই হবে।'

রামহরি গাঁজায় একটা দম দিয়া প্রচুর উৎসাহের সহিত চীৎকার করিয়া কহিল—'বাবার নামই যে আশুতোষ! কর্ত্তা মহারাজ, হবে না, আমরা সে সব নন্দী ভৃঙ্গী' একথা বলিয়া সে রামলাল মুখুয্যের পা দু'খানা মাথায় তুলিয়া লইয়া ভক্তিপ্রকাশ করিল। তাহারা সকলে যে এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া কতটা আনন্দিত হইয়াছে তাহা জানাইবার জন্যই আজ সকলে এখানে আসিয়া জড় হইয়াছিল।

এমন সময় লাঠিখানা ভর করিয়া মাটীর দিকে মাথা নীচু করিয়া অতি কষ্টে সুবোধ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সুবোধের দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত নাসা, ভাসা-ভাসা চক্ষু হইতে এখনও বুঝা যাইতেছে যে সুস্থ শরীরে সে সত্যসত্যই অতি সুন্দর যুবক ছিল। এখন মাথার রুক্ষ দীর্ঘ কেশ, কালিমাখা কোটর-গত চক্ষু, বিবর্ণ গণ্ড, ও রোগ-মলিন কঙ্কালসার দেহখানি দেখিলে সত্য সত্যই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সুবোধকে পাড়ার ঐই সব হতভাগারা অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিত; তাহারা তাহাকে দেখিবামাত্রই 'কর্ত্তা পেন্নাম হই—যাই ক্ষেতে যাই' ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া একে একে প্রস্থান করিল। রামলাল পুত্রকে এই ভাবে সেখানে আসিতে দেখিয়া স্নেহ গদগদ স্বরে কহিলেন,—এরূপ স্নেহ-প্রদর্শন সুবোধ জীবনে পিতার নিকট হইতে কোনদিন পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। রামলাল কহিলেন—'বাবা, তুমি বাইরে চলে এলে কেন? শরীরটার দিকে একটু নজর নিও। বোধ হয় একমাসের মধ্যেই বিবাহটা—'

সুবোধ বাধা দিয়া কহিল—'আর শরীরের দিকে নজর! আমার যে বাবা, দিন ফুরিয়ে এসেছে! আমি আজ তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে এসেছি।'

রামলাল কহিলেন—'এ সব অলুক্ষণে কথা কেন বল্‌ছো বাবা! অসুখ সে সকলেরই হয়। তার পর তোমার যে ঘরে সম্বন্ধ কল্লুম—'

'এ বিষয়ে কি একবার আমার একটা মত গ্রহণ করা উচিত ছিল না? শুনেছি সেকালে ঘাটের মড়ার সহিত কুলীন-

মেয়েদের বিয়ে হ'ত, এযুগেও, কি তাই হবে? আমি তিনবৎসর যাবৎ ভুগ্‌ছি, একদিন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন না, যদি প্রথম হ'তে নিজে গাঁজা মদে ডুবে না থেকে, আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর্ত্তেন, তাহ'লে বোধ হয় আমি আজ ভাল হ'য়ে যেতুম—কিন্তু এখন যে আমি মরণের পারে এসে দাঁড়িয়েছি। বাবা—একটী নিরীহ মেয়েকে বধ ক'র্‌বেন না, মানুষের পাপের একটা সীমা আছে, কিন্তু এমন পাপের আর সীমা নেই, এমন গুরুতর অন্যায়ের মার্জ্জনা ক'র্‌বার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতারও নেই! বাবা, আমি বিয়ে ক'র্‌তে রাজী নই, আমি কোন মতেই এমন অন্যায় কাজ ক'রে একটা মেয়েকে চিরজীবনের জন্য বধ কর্‌বো না। আর আমার কোন বক্তব্য নেই, শুধু একথা বল্‌তেই এসেছি। আপনি কি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?'

আনন্দের আতিশয্যে গাঁজার মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত চড়াইয়া মুখুয্যের মস্তিষ্কটা একটু গোলমেলে হইয়া ছিল, তিনি বিরক্তির সহিত ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—'আজকালকার ছেলেদের মত নিলর্জ্জ আর বেহায়া পঁচিশ বছর আগেও ছিল না। ছিঃ ছিঃ তোমার এ সব কথা আমায় বল্‌তে লজ্জা বোধ হ'ল না? সংসারের বাপ মা সন্তানের যত কল্যাণ দেখেন, অন্যে কি সে রকম ভাবেন? এত বড় একটা বড় ঘরে তোমার বিয়ে হ'লে, চিকিৎসা বল, বায়ুপরিবর্ত্তন বল, সব যে ভাল ভাবে চল্‌বে। সে সুবিধেটাত আর আমরা গরীব মানুষ ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। মা জগদম্বার ইচ্ছায় দু'চার

দিনের মধ্যেই তোমার শরীর শুধ্‌রে যাবে। বাবা! তোমাদের সুখ. স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই ত এ বিয়ে ঠিক্ কল্লুম, নতুবা আমরা—আমরা আর কয়দিনই বা আছি! শিবশঙ্কর!'

সুবোধ নীরবে পিতার কথা শুনিল। আমাদের দেশ কি না, শ্রীরামচন্দ্রের দেশ! কাজেই যে উত্তেজনা ও অশান্তি লইয়া সুবোধ পিতার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল—সেই উত্তেজনা পিতার এই প্রবোধবাণীতে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। তারপর মানুষ চিরদিন আশার পেছনেই ছুটিয়া বেড়ায়—মৃত্যুর কোলে শুইয়াও যখন মানুষ মরিতে চাহে না, তখন রোগজীর্ণ ক্লান্ত দীর্ণ সুবোধের প্রাণেও আশা অনেক নূতন কথা শুনাইল সে বলিল—বেশ কথাত, বড়লোকের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ, অতুল ধন রত্ন ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ, ধীরে ধীরে সে সবই ফিরিয়া পাইবে। এই মোহিনী-বাণী সুবোধের প্রাণে নবীন উৎসাহের সৃষ্টি করিল—সে যেন সে মুহূর্ত্তেই প্রাণে অনেকটা বল ও দেহে অনেকটা শক্তি অনুভব করিল। ধীরে ধীরে পিতার দিকে মুখ তুলিয়া কহিল—'তা আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।' এ দু'টী কথা কহিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

পুত্র চলিয়া গেলে মুখুয্যের মুখে জয়শ্রীর বিকট হাস্য ফুটিয়া উঠিল। একছিলিম গাঁজা স্বহস্তে সাজিয়া খাইয়া চক্ষু মুদিয়া কহিলেন—"জয় শিব শঙ্কর! আশুতোষ, তোমার ইচ্ছা!!"

ভূপতি কহিল 'নিরু! এইবার জীবনটাকে কিন্তু নূতন ভাবে সুরু করতে হবে। প্রজাপতির মত রঙ্গিন পাথনা মেলে আর ছুটাছুটি করা চল্‌বেনা।" নিরুপমা এক থানা খয়ের রংয়ের ঢাকাই জাম্‌দানি কাপড় পরিয়া তাহার পড়িবার ঘরে ভূপতির কাছে পড়িতে বসিয়াছিল। নিরুপমা আসিবামাত্রই ভূপতি ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে এ কথা কয়টি কহিল। নিরুপমা—বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা যেমন সচরাচর লজ্জাবতী হয় ঠিক্ সেইরূপ লজ্জাবতী লতাটির মত ছিল না। জমিদার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বেলা হইতে যখন যে আবদার করিয়াছে তাহাই পূর্ণ হইয়াছে, যখন যে দাসদাসীকে যে কায করিবার আদেশ করিয়াছে তাহাই বিনা ওজরে সম্পন্ন হইয়াছে কাজেই নিরুপমার স্বভাবটা ছিল উগ্র এবং এক কথায় সে কতকটা নির্লজ্জাও বটে। ভূপতি দাদা তাহার মাষ্টার হইলেও সে তাহাকে বড় একটা সমীহ করিয়া চলিত না, তাহার কারণও ছিল কতকগুলি—প্রথম নম্বর ভূপতি অনিলের বন্ধু, নিরুপমা বাল্যে দাদার কাছে যত না আবদার করিয়াছে, ভূপতি দাদার কাছে তাহার অধিক বায়না করিয়া উৎপীড়ন করিয়াও কোন দিন একটা ভর্ৎসনার বাণী শোনে নাই, কাজেই ভূপতি দাদাকে কোন কথা বলিতে সে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিত না। নিরুপমা ভূপতির কথায় হাসিয়া কহিল—'কেন তোমারত

ডানা দুটী এতদিনেও কাটা যায় নাই, শুধু কি আমাদের বেলাই সব দোষ নাকি ? জান আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ, এযুগে আমাদের শক্তিই প্রবল, আমরাও স্বাধীন।' সাধারণতঃ গ্রামের মেয়েরা যেমন হয়, নিরুপমার সহিত তাহাদের তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। অনিল ও ভূপতির কাছে সে সদা সর্ব্বদা রাজনীতি বল, ধর্ম্মনীতি বল, শিল্প বল, দেশোদ্ধার বল সব কথাই শুনিতে পাইত,—বাঙ্গলাদেশের এমন সাপ্তাহিক পত্র ছিল না যাহা সে পাঠ না করিত। নিরুপমা যে শুধু সুন্দরী ছিল তাহা নহে—সব দিকেই তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, গানে, বাজনায়, শিল্পে, লিখন-পঠনে সে অল্প বয়সেই বেশ শিক্ষিত সমাজে চলিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

ভূপতি কহিল—'সে কথা কি আর অস্বীকার করিবার যো আছে ?' 'কি করে করবেন ভূপতি দাদা ?' নিরুপমা বরাবরই ভূপতিকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত, সে কোন দিন মাষ্টার মশাই বলে নাই।

ভূপতির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য দাদার জেদও তাহার অজ্ঞাত ছিল না ; এ বিবাহ হইলে বোধ হয় সে সুখীই হইত, কারণ ভূপতির প্রতি তাহার যে অন্তরের একটু আকর্ষণ না ছিল তাহা নহে। সমাজের নিগড় আমাদের দেশে কত যে ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অবধি নাই, একটা মিথ্যা মন-গড়া নিগড়ের মাঝখানে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া আমরা কত সময় কত ভাবে যে হাহাকার করি

তাহার অবধি নাই। এমনি মূঢ় আমরা যদি কোন মহাজন অন্যায় বন্ধনের মোহ বেষ্টনীটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সমাজে নূতন শৃঙ্খলা ও নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতে চাহেন, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধেই আবার হুঙ্কার তুলি—এমনি আমাদের মনুষ্যত্ব। ভূপতি নিরুপমার কথায় হাসিয়া কহিল—'আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার শিক্ষা তোমার সার্থক হউক, তুমি তোমার নূতন জীবনে শান্তি লাভ কর।'

নিরুপমা উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—'ভূপতিদা! আপনি ব্রাহ্ম ছিলেন কবে?'

ভূপতি একটু লজ্জিত হইয়া কহিল—'কেন?'

'আপনি যে রকম প্রার্থনা কচ্ছেন তাই শুনে মনে হল।'

ভূপতি নিরুপমার এই বিদ্রূপে মনে মনে একটু দুঃখিত হইয়া কহিল—'নিরুপমা, আমাকে আচার্য্যই বল আর ব্রাহ্ম-সমাজের পাণ্ডাই বল—এ আমার প্রাণের কথা। মানুষ স্বার্থপর—আমিও স্বার্থপর, আমি চাই আমার শিক্ষা দীক্ষার গুণে তুমি যেন স্বামিগৃহে সুনাম লাভ কর—ব্যস্ আর কিছু নয়।'

'আপনার এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ চিরদিন ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।' নিরুপমা বিদ্রূপ করিয়া এ কথা কয়টি কহিলেও তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অজ্ঞাত বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এতদিন একভাবে দিন কাটিয়া গিয়াছে, শুধু হাসি খেলা আনন্দ এই ছিল জীবনের একমাত্র তৃপ্তি, কোন

দুশ্চিন্তা—কোন দুর্ভাবনা তাহার ছিল না, আর আজ কিনা—সে কোন্ এক অচেনা অজানা চির অপরিচিত যুবকের ক্রীড়া-সঙ্গী হবে! তাহার সুখে, দুঃখে, আনন্দে, নিরানন্দের দোলনার সঙ্গে দুলিতে দুলিতে তাহার জীবন-তরী ভেসে চল্‌বে। সত্যই ত বিষয়টা সে যত সরল ও সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল একটু ভাবিয়া একটু ধীরতার সহিত—মনের সহিত মিলাইতে গিয়া সে দেখিল কোথায় যেন কি একটা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শরতের সুন্দর প্রভাত যেন আকাশের নীলিমায়, তরুলতাগুল্মের শ্যামল সবুজ শোভায়—বিহগের কূজনে গুঞ্জনে সেফালিকার সুরভি-ভরা মধুর হাস্যে প্রাণে শুধু আনন্দের গানই ঝঙ্কৃত করিয়া দেয়, এ যেন তাহা নহে—এ যেন মেঘের আঁধারে ঢাকা পূর্ণচন্দ্রের মত, কে জানে মেঘের যবনিকা সরিয়া যাইয়া জীবন চির প্রফুল্ল করিয়া দিবে কিনা, কে জানে চন্দ্র ফুটিবে কি মেঘেই ঢাকা থাকিবে! জীবন কোন পথে অগ্রসর হইবে সে কথা সে ত জানে না, তাই যত সরল ভাবে হাস্য-কৌতুকের সঙ্গে প্রথমে নিরুপমা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন যেন সে ভাবে আর কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—'ভূপতিদাদা! স্ত্রীলোক হ'য়ে জন্মানই বিড়ম্বনা।"

"কেন?"

নিরুপমা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আর কেন; জানইত দিন রাত্রি—

"লহ লহ করি পরে আরাধনা
অশ্রু-সাগরে ভাসা !"

'নিরু ! সে যে উভয়তঃ।' আজ ছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে পড়াশুনার কোন কথাই হইতেছিল না। তাহার কারণও ছিল, আজ ভূপতি নিরুর কাছ হইতে চির বিদায় লইতে আসিয়াছিল।' কাল সন্ধ্যাবেলা চৌধুরী মহাশয় ভূপতিকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে. 'নিরুপমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এখন অর তাহার পক্ষে একজন যুবকের কাছে পড়াশুনাটা ভাল দেখায় না, এতদিন কোন কথাই উঠে নাই, কিন্তু এখন পরের বাড়ীর মনের দিকে চাহিয়াই যখন চলা প্রয়োজন, এরূপ স্থলে নিরুপমার এপর্য্যন্ত পড়াশুনা যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট আর পড়াশুনার কোনও প্রয়োজন নাই।' ভূপতি নিরুপমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে, এজন্য চৌধুরী মহাশয় তাহাকে পারিশ্রমিক ব্যতীতও তিনশত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দান করিলেন, এবং নিরুপমাকে একবার বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সেদিন তাহাকে অন্তঃপুরে আসিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

নিরুপমা ভূপতির কথায় হাসিয়া উঠিল। এই তরল সরল উচ্চ হাসি বিদ্যুতের খেলার মত ভূপতির কাছে বড় মধুর লাগিতেছিল। সুন্দরী কিশোরীর এই হাসির মাঝখানে যে কত তৃপ্তি কত আনন্দ তাহা তরুণের কত প্রিয় প্রৌঢ় বয়সে সেটা বোঝা যায় না। নিরুপমা কতদিন মনে করিয়াছে

যে এই ভূপতিদাদার সঙ্গে যদি তাহার বিবাহ হইত তাহা হইলে কি সুন্দর কি মধুর হইত। ছেলেবেলা হইতে জানা শুনা চিরপরিচিত, আর ত তাহাকে অজানা ভাবনায় হাবুডুবু খাইতে হইত না। কিন্তু বিধাতা কোনদিনই মানুষের কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না। নিরুপমা একবার ভূপতির দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল—মাথার এলোমেলো চুলগুলি তাহার মুখে পড়িয়া খানিকটা ঢাকিয়া দিল, ভূপতি স্নেহের সহিত ধীরে ধীরে চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া সরাইয়া মুগ্ধ নয়নে এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—'নিরু, তুমি এত সুন্দর—' হঠাৎ ভূপতি একথাটা কহিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—'তবে এখন আমি যাই।' নিরুপমার কাছে ভূপতির এই সৌন্দর্য্যের অভিনন্দন বড় মধুর লাগিল, সে কৌতুক হাস্যে কহিল—'ভূপতি দাদা! আমি যে সুন্দর, সে পরিচয়টা কি তুমি আজ নূতন পেলে নাকি?' ভূপতি নিরুপমার কথায় হাসিয়া কহিল, 'বুঝি এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই।'

'আজই তোমাদের বাড়ী গিয়ে বৌদিকে বলে দোব।'

'বেশত কোন দোষ নেই, যে সুন্দর—তাকে সুন্দর বল্‌ছি বলে সুবালার ত রাগ হবার কোন কারণ নাই।'

নিরুপমা নীরবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইয়া কাপড়ের আঁচলটা অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে কহিল 'তাহলে কি আজ এই গল্প ক'রেই কাটাইয়া দেবে, কিছুই পড়াশুনা হবে না?'

ভূপতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'আজ তার শেষ।'

'সে কি রকম?'

'অর্থাৎ তোমার বাবা এই খানিক আগে আমায় ডেকে বল্লেন যে, নিরুপমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে, এ মাসেই হয়ত বিয়ে হবে, এখন আর তার লেখাপড়ার কোন আবশ্যক নেই—পাত্রপক্ষ একথা শুন্‌লে হয়ত বিগ্‌ড়ে বস্‌বেন। তাই আজ আমাকে বিদায় দিয়েছেন। নিরু আমার সব দোষ, সব ত্রুটি ক্ষমা করো।' তার পর নিরুপমার কোমল দু'খানি হাত নিজের হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কহিল 'নিরু—' ভূপতির চোখে কোথা হইতে যেন হঠাৎ শ্রাবণের বন্যা আসিয়া পড়িল। নিরুপমা কখন কি ভাবে কেমন করিয়া যে ভূপতির বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা দু'জনের কেহই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ভূপতি হঠাৎ আপনাকে সংযত করিয়া কহিল—"তবে আমি যাই নিরু, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হবে।"

নিরুপমা আর একটী কথাও কহিল না, সে হঠাৎ হাঁটু গাড়িয়া মাটীতে বসিয়া ভূপতিকে নমস্কার করিয়া দ্রুত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। এ দৃশ্য কিন্তু একজনের চক্ষু এড়ায় নাই।

৬

আমাদের দেশের বড় লোকেরা অর্থের ব্যবহারটা যে ভাল করিয়া জানেন এ কথা কোনরূপেই বলা চলে না। দু'চারি-

জনের সম্বন্ধে এ কথা না খাটিলেও সাধারণভাবে কথাটা অতি সত্য। আজকাল দু'চারিজন শিক্ষিত ধনী সন্তান অবশ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আরও দশটা দেশের হিতকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ধনের সার্থকতা করিতেছেন, কিন্তু অসংখ্য ধনি-সন্তানের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা কয়জন ? যে দেশের লোক সর্ব্ববিষয়ে পরাধীন, যে দেশের লোকের অধীনতা শুধু দেশের শাসন সংরক্ষণের ভার পরের হাতে বলিয়াই শুধু নহে, শিল্প-বাণিজ্যে সব বিষয়েই যাহাদের অধীনতা, তাহাদের জাগিতে হইলে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিতে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সে জাগরণ আমাদের কোথায় ?

ভোরের বেলা বাহিরে জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে পুরোহিত, পণ্ডিত, গ্রামের মাতব্বরগণ সকলে সমবেত হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তিনি তখন পর্য্যন্তও বাহিরে আসেন নাই। নিষ্ঠাবান্ চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধ্যা আহ্নিক স্নান তর্পণ ইত্যাদি করিতে অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। এ কথা সকলের জানা থাকিলেও—পাছে একটু বিলম্বে গেলে চৌধুরী মহাশয় অসন্তুষ্ট হন, সেজন্য কে আগে যাইয়া বৈঠকখানায় আসন গ্রহণ করিবেন সে দিক্ বিবেচনা করিয়া যাহাদের প্রয়োজন ছিল এবং যাহাদিগকে জমিদার মহাশয় আবাহন করিয়াছেন তাহারাও আসিয়াছেন, আর যাহাদিগের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহারাও অপ্রয়োজনে জমিদার মহাশয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বৈঠকখানা বেশ সরগরম্ হইয়া উঠিয়াছিল। ভৃত্য রাম-সদয় ও রামচরণ ঘন ঘন তামাক জোগাইয়াও উপস্থিত ভদ্রজনগণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিতেছিল না। পুরোহিত মহাশয় ও সভাপণ্ডিত মহাশয়ও ঘন ঘন নস্য গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র আওড়াইয়া সকলকে বুঝাইতেছিলেন যে, অগ্রহায়ণ মাসই বিবাহের অতি প্রশস্ত সময়। অপরিচিত ভদ্র মহোদয়গণ নীরস শাস্ত্রালোচনার দিকে মন না দিয়া জমিদারের একমাত্র কন্যার বিবাহে কি কি ব্যবস্থা উপযুক্ত হইবে তাহা লইয়াই তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। যাহারা ভোজন বিলাসী তাহারা যত প্রকার সুখাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে সে দিকের আলোচনা এমন কি মুখে মুখে একটা লিষ্ট পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে-ছিলেন, আমোদপ্রিয় যুবকেরা বাইজী ও খেমটাওয়ালীর প্রাতঃস্মরণীয় নামের তালিকা আওড়াইতেছিলেন। সার্কাস, বায়স্কোপ ও থিয়েটারের কোন্‌টা কোন্ দিন কি ভাবে কোথায় সম্পন্ন হইবে সে আলোচনা চলিতেছিল। এরূপ সময়ে কর্ত্তার খোদ খানসামা কর্ত্তামহাশয়ের গড়গড়া লইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে কর্ত্তা মহাশয়ের শুভাগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই, কাজেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া গোলমাল কমাইয়া চুপ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। একটু পরেই কাষ্ঠ পাদুকার খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে শশীবাবু বৈঠকখানা-গৃহে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, জমিদার

মহাশয়ও হাসিমুখে বৈঠকখানা-গৃহের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। ফরাসের মধ্যস্থলে গদি ও তোষকের স্বতন্ত্র সুন্দর ধবধবে চাদর বিছান উচ্চ আসন। আসনের দুইদিকে দুইটী এবং মধ্যস্থলে একটী তাকিয়া ছিল। শশীবাবু ধীরগমনে-সেখানে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং সকলকে বিনয়নম্র ভাবে সুমিষ্টস্বরে কহিলেন—'একি আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, বসুন, পণ্ডিত মহাশয় বসুন।' পুনরায় সকলে আবার নিজ নিজ স্থান অধিকার করিলেন।

চৌধুরী মহাশয় গড়গড়া টানিতে টানিতে কহিলেন—'বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! দিনটাকে দেখেছেন?' বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ভাল করিয়া নস্য গ্রহণ করিয়া একটু কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন 'আজ্ঞে, অগ্রহায়ণ মাস অর্থাৎ বর্ত্তমান মাসটা বিবাহের প্রশস্ত সময়, আমি ২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার, বিবাহের দিন স্থির ক'রেছি, কারণ শাস্ত্রে আছে—

গুরুশুক্রবুধেন্দুনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ।

চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন 'আমিও এদিনটাই প্রশস্ত সময় মনে করি। এখনও হাতে বারো দিন আছে, একটু সামান্য আয়োজনও ত কর্ত্তে হবে।'

সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কহিল 'বৃহৎ আয়োজন! বিরাট ব্যাপার!' চৌধুরী মনে মনে তৃপ্তিলাভ করিয়া হাসিয়া কহিলেন 'এ সামান্য আয়োজনে আপনারা যদি সকলে আমার সাহায্য না করেন, তাহ'লে যে কোন মতেই পেরে উঠ্‌বো না।'

আবার সকলে কোলাহল করিয়া কহিল 'নিশ্চয় নিশ্চয়!'

আমি মনে ক'রেছি, দু'একদিনের মধ্যেই আপনাদের দশজন শুভানুধ্যায়ীকে আহ্বান ক'রে একটা ফর্দ্দ তৈরী করে ফেলি—তারপর জিনিষপত্র সংগ্রহ, ও লোকজনের ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য ম্যানেজার বাবুকে বলে দিই। সময় সংকীর্ণ।' গ্রামের একজন যুবক অগ্রগণ্য হইয়া কহিল 'আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, কর্ত্তা মহাশয়, আমরা সব উঠে, পড়ে লাগ্‌লে একদিনের ভেতরই দশদিনের কাজ সেরে ফেল্‌তে পারবো।'

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কাব্য কাব্যালোচনা করিয়াই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন, তার উপর আদিরসের উদ্ভট শ্লোকের অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহার প্রাণে সঞ্চিত ছিল। আমোদ ও নৃত্যগীতের কোনও কথা উঠিতেছে না দেখিয়া তিনি যুবকদের উপর একটু বিরক্ত হইয়া পুনরায় নস্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন—'শাস্ত্রে আছে বিবাহ ইত্যাদি আনন্দ-উৎসবে বারাঙ্গনার নৃত্যগীত প্রশস্ত।' যুবকেরা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া পরস্পরে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। শশীবাবু হাসিয়া কহিলেন 'সেত হবেই বিদ্যালঙ্কার দাদা! রাত্রিতেই বসে সব বিষয় ঠিক করা যাবে।' বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন—'জামাই বাবাজীর কি করা হয়? বয়স কত? সংসারে তাঁর কে কে বেঁচে আছেন?'

'এবার বি, এ, পরীক্ষা দেবে, বয়স কুড়ি একুশ বৎসর হবে। মস্ত বড় কুলীন জনাইএর মুখুয্যে।'

'বেশ! বেশ! তা ফর্দ্দ একটা ধরা যাবে—পণ্ডিতদের ত নিমন্ত্রণ করার ভারটা বরাবরের মত আমার হাতেই থাক্‌বে?'

'সেত নিশ্চয়ই! আর এমন উপযুক্ত লোক কে আছে বলুন ত?'

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জমিদার বাবুর নিকট হইতে এইরূপ সাদর অভিনন্দিত হইয়া ঘন ঘন দুই তিন বার নস্য গুঁজিয়া হাসিয়া কহিলেন 'আপনারা হলেন দেবতার অংশ, শাস্ত্রে আছে, অর্থশালী, শক্তিশালী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি বিধাতার বিশেষ কৃপার পাত্র—বিশেষতঃ রাজা বা ভূম্যধিকারী তাঁরা ত সাক্ষাৎ দেবতা।'

এইভাবে সেদিন ভোরের বেলা নানা গল্প গুজবে অতিবাহিত হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ফর্দ প্রস্তুত হইল—ফর্দে সারকাস, বায়স্কোপ, থিয়েটার, যাত্রা কাঙ্গালীভোজন কিছুই বাদ গেল না। বিশিষ্ট অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য পোলিটির বাড়ীও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল। দেশী ও বিলাতী মদের পরিমাণও প্রচুর ছিল। মোট কথা অর্থের সদ্ব্যয় অপেক্ষা অপব্যয়ের যতটা আবশ্যক তাহার কিছুরই কোন অভাব ছিল না।

* * * * *

অল্প কয়েকদিন মধ্যেই নন্দপুর, নন্দনপুরের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইল। বিবাহের আর তিন দিন বাকী। নীলমণি ঘটক বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে বর ও বরপক্ষীয় জনগণের সহিত

আসিয়া পঁহুছিবে; এজন্য কয়েকদিন হইল সেখানে প্রেরিত হইয়াছেন।

যাহার বিবাহ, সেই সুবোধের মনে কিন্তু বিন্দুমাত্রও আনন্দ ছিল না। ফাঁসীর আসামী যেমন ফাঁসীকাঠের নিকট যাইতে কাঁপিতে থাকে, তাহার প্রাণও বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল ততই দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল। মরণের পারে দাঁড়াইয়া যাহার কাছে ওপারের ভীষণ আঁধারের চিত্র দিবারাত্রি ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার কাছে বসন্ত যামিনীর প্রফুল্ল ঝঙ্কার কেন? শ্মশানে প্রফুল্ল সুরভি কুসুমের সুধামাখা সৌরভের কি প্রয়োজন? কত বড় সে পাপিষ্ঠ—মৃত্যু নিকটে জানিয়াও কিনা সে একজন সরলা বালিকার জীবন চিরদিনের জন্য অন্ধকারের কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিতে চলিয়াছে, এতটুকু সাহস নাই তাহার বিরুদ্ধে সদর্পে দাঁড়াইতে? ধিক্ সে! এইরূপ নানা দুশ্চিন্তার মধ্যেও কয়েকদিন যাবৎ সে একটু সুস্থ ও সবল বোধ করিতেছিল, তাহার জ্বরের প্রকোপটা আর হয় নাই। জীর্ণ—শীর্ণ দুর্ব্বল দেহেও প্রাণে সত্যসত্যই কোথা হইতে যেন একটা আনন্দের তড়িৎ রেখা তাহার দেহে একটা নূতন শক্তি জাগাইয়া দিতেছিল। আশা মানুষের কাণে কাণে কত উৎসাহের কথাই না বলিয়া থাকে? আশা বলিতেছিল, 'ভয় কি? মানুষ মরণের কোল হইতেও বাঁচিয়া আসে, হয়ত এই নারীর সুখ সৌভাগ্যে তোমার জীবন আবার নবীনভাবে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ আশার পুলকভরা দোলনার মধ্যে দুলিতে দুলিতে

সুবোধ তাহার জীবনে আবার আশার গীতি গাহিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে তাহার পিতার কথা শোন। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অর্থকে এবং আত্মসুখকেই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও কামনা বলিয়া মনে করেন। তাহারা অর্থ সংগ্রহের জন্য এমন কোন কায নাই যাহা করিতে না পারেন। তাহাদের কাছে ঈশ্বর, পরকাল, মৃত্যু এ সব অলীক বলিয়া বিবেচিত হয়। রামলাল মুখোপাধ্যায়ও সেই শ্রেণীর লোক। যতদিন সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর অত্যাচার অবিচার এবং ঘুষ খাইয়া ও মদ গাঁজা খাইয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছেন। এমন কোন পাপ ছিল না যাহা তিনি করেন নাই। বিধাতার কি নিষ্ঠুর অভিশাপ, এত অন্যায় করিয়াও কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় কোন দিন সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই। স্ত্রী রুগ্না, সন্তান দুইটী রুগ্ন; অর্থের অভাবও কম নয়, এ সব নানা কারণে বড় অশান্তিতেই তাহার দিন যাইতেছিল, এসময়ে নীলমণি ঘটকের শুভাগমন ও জমিদার-কন্যার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় তাহার প্রাণে যেন নবযৌবনের উদ্দাম উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছিল। সুবোধ বিবাহ করিতে অস্বীকার হওয়ায়, মুখুয্যে মহাশয় মনে যে অশান্তি বোধ করিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন,'বিবাহের পর সুবোধের মৃত্যু হইলেও তাহার কোন ক্ষতিই হইবে না! ঈশ্বর যেন দয়া করিয়া ততটুকু

অনুগ্রহ করেন। রামলাল বাবুর এই প্রার্থনা সত্যসত্যই ঈশ্বর শুনিয়াছিলেন। এ কয়দিন পুত্রের মুখে স্বাস্থ্যের একটু লক্ষণ দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণে আনন্দের উদয় হইয়াছিল—বুঝি ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর হইতেই মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীর শ্রী অনেকটা ফিরিয়া গিয়াছে। তখন বাহির বাড়ীতে কোন জঙ্গল নাই, প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভাঙ্গা দালানখানা আংশিকরূপে মেরামত হইয়া নূতন চূণকাম হইয়া ধব ধবে সুন্দর দেখাইতেছে। গৃহিণীও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়া চলাফেরা করেন। নীলমণি ঘটক বর ও বরযাত্রিগণকে লইতে আসায় ছোট রায়পুর গ্রামখানিতে রীতিমত একটা তোলাপাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের প্রাচীনেরা রামলালের শুভ অদৃষ্টের শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রাচীনারা ঈর্ষ্যাদগ্ধ প্রাণে নিজ নিজ অদৃষ্টের ধিক্কার দিতে লাগিল।

গ্রামের যুবকেরা দলে দলে বিবাহে যাইবার জন্য সজ্জিত হইল। তারপর এক শুভ দিনে সকলে শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিয়া হুগলী ষ্টেশন হইতে গাড়ী ধরিয়া বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিল। সকলের মুখেই হাসি—সকলের মুখেই আনন্দ-লীলা, শুধু সুবোধের দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছিল। গ্রামের সীমা ছাড়িয়া আসিতে তাহার প্রাণ কি জানি কেন এক অব্যক্ত বেদনায় কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা দুঃখিনী জন্মভূমির রোগ-

জীর্ণ সন্তান সে আর মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিবে না। বুঝি এজন্মে এই নদী, এই বন, এই গাছ পালা আর সে দেখিতে পাইবে না। বিবাহ তরুণের আনন্দ উৎসব, উৎসাহের খনি। তাহার কিনা সেই আনন্দ-উৎসবের উল্লাস কোন মতেই স্থায়ী ভাবে আনন্দ দিতে পারিতেছিল না।

মুখুয্যে মহাশয় গভীর আনন্দে যাত্রাপথে ঘন ঘন গাঁজার ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া যাইতেছিলেন।

৭

মাধুরী দেবী অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া কহিলেন, "নিরু লক্ষ্মীটি, কাঁদিস্‌নি, ছি কেঁদে কি অকল্যাণ কর্‌তে আছে?"

নিরুপমা কোন কথা কহিল না, বিছানার উপর উপুড় হইয়া তেমনি ভাবে কাঁদিতে লাগিল। কোথায় বেশ ভূষা, কোথায় তার রত্ন-মণি-কাঞ্চনে গড়া মূল্যবান অলঙ্কার, সে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কিছুই পরে নাই। বিমাতার সান্ত্বনা বাক্যে সে একটী কথাও কহিল না, আরও বেশী করিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাধুরী নিরুপমার মাথাটি নিজ কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন 'মা, কেঁদে কি হবে। জানিস্‌ত স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা নাই, সমাজ যা বল্‌বে তাই মেনে চল্‌তে হবে। নতুবা আমার মত বয়সী মেয়ের কি তোর বাবার সঙ্গে—' কথাটা বলিতে যাইয়া বুদ্ধিমতী মাধুরী দেবী

হঠাৎ থামিয়া গিয়া কহিলেন—'নিরু! তুমি কিছু ভেব না, সবই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করতে হয়। জানিসত কত জন বৃদ্ধ রুগ্ন স্বামীর হাতে পড়েও সধবা মরে যান, আর কেউ যুবার হাতে পড়েও বিধবা হয়, এ শুধু কর্ম্মফল, ঈশ্বরকে ডাক, ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, তিনিই মুখ তুলে চাইবেন।'

নিরুপমা মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া কহিল 'আমি কি এমনি ভেসে এসেছিলুম তোমাদের কাছে;—যে তোমরা কোনমতে আমাকে দূর ছাই করে তাড়িয়ে দিতে চাও। দেশে কি আর—কোথাকার এক পুরুষের কথার উপর নির্ভর ক'রে বাবা আমাকে এমন ক'রে বলি দিতে যাচ্ছেন?' মাধুরী কোন কথা কহিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন। তোমরা হয় ত চোদ্দ পনের বছরের কিশোরী যুবতীর মুখে এতগুলি কথা শুনিয়া কত কি মনে করিতেছ, কিন্তু আমরা একটী বর্ণও মিথ্যা বলি নাই, যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতে'ছ। কথাটা হইতেছে যে বর যাত্রীর দল যখন নন্দপুর আসিয়া পঁহুছিল, তখন বর দেখিবার জন্য সকলেরই একটা তাড়া পড়িয়া গেল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলেই একে একে বর দেখিয়া গেলেন। কিন্তু বর দেখিয়া কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। পাড়ার প্রাচীনারা ত স্পষ্ট বলিয়াই ফেলিল "এই ঘাটের মড়া, নীলমণি ঘটক কোথা থেকে কুড়িয়ে আনলে?"

যুবকেরা গর্জ্জিয়া কহিল—"আজকালকার দিনেও কি মানুষের প্রাণে কৌলীন্যের এমন মোহ থাকে?"

একজন যুবক কহিল—"আচ্ছা,কৌলীন্যের কথা রেখে দিলুম, শুন্‌তে পাই বর এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবে, যে ছেলে বি, এ, পরীক্ষা দেবে, সে যে কিছু না কিছু লেখা পড়া শিখেছে, অন্ততঃ নিজের ভাল মন্দটা বিচার করবার ক্ষমতাটা তার হয়েছে, এ কথাত আর ভাই অস্বীকার কর্‌বার যো নেই, তবে কোন্‌ বিবেচনায় বিয়ে কর্‌তে এল ?"

একজন যুবক সে ছিল Social Reformer—সে সমাজের সংশোধন ব্যতীত দেশের কল্যাণ নাই, এ কথাই সকলকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিত, সে কহিল "তোমরা হাজার বিলিতী কাপড় পোড়াও, হাজার লেক্‌চার দাও, ঠিক জেন যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন কর্‌তে পারবো, ততদিন আমাদের কোন আশা নেই। নিরুপমার মত সুস্থ সবল সুশিক্ষিতা মেয়ের যোগ্য কি এই বর ? অনিলের প্রস্তাব মত যদি ভূপতি দাদার সঙ্গে নিরুপমার বিবাহ হ'ত, তা হ'লে কত সুন্দর হ'ত, চৌধুরী মহাশয় ত বুঝ্‌লেন না।"

আর একজন কহিল "সে এবার এম্‌ এ, পাশ করিয়াছে। আশা আছে একটা ডেপুটির পদ পাইবে। গর্ব্বভরে উচ্চকণ্ঠে কহিল "ওসব lofty ideas কোথা থেকে থাক্‌বে বল ? Education চাই। বাস্তবিকই বড় Sad হে।"

একটী নিরীহ চরিত্রের শান্ত যুবক কহিল "ওসব কিছু নয়, সকলই দয়াময়ের ইচ্ছা।" (এ যুবকটি একজন ব্রহ্মচারী—পরম হিন্দু। ভয়ানক অদৃষ্টবাদী।) এই দেখনা সাবিত্রীত তার মৃত

স্বামীকেও যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আন্‌লেন। নিরুপমার যদি ঈশ্বরে ও স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তা হ'লে রোগের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে নিশ্চয়ই তার স্বামী কন্দর্পকান্তি পুরুষ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

এইরূপ গ্রামের ঘরে ঘরে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বরের রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দের শতরূপ আয়োজন সম্মুখে দেখিয়াও ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। কেহ কেহ এমন আশঙ্কাও করিতেছিলেন যে নিরাপদে বিবাহটা হয় কি না।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ও জামাতার মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নীলমণিকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া রোষগম্ভীর স্বরে কহিলেন "নীলমণি, এমন করেই কি সর্ব্বনাশ করতে হয়।"

ঘটক চূড়ামণি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া কহিল "আপনার আদেশ পালন ক'রেছি, আমার কি অপরাধ?"

চৌধুরী মহাশয়ের প্রাণে আজ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত বহুদিনের লুকান কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। মাতৃহারা বালিকা— আজ তিনি তাহাকে কাহার হাতে সমর্পণ করিতে চলিয়াছেন? এই সুকোমলা মল্লিকাফুলের মত অনিন্দ্য যৌবন সুষমার মুকুলিতা মধুর মাধবী লতার যোগ্য কি ঝঞ্ঝাবাজহত দাবাহগ্ধ তরু? আজ কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে হতভাগা পিতার এই মর্ম্মবেদনা অন্তরে অনুভব কচ্ছো? তাঁহার হৃদয় বেদনায় ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি উন্মাদের মত অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন "অপরাধ! সত্যই

ত তোমার কোন অপরাধ নেই। আমি বাপ হ'য়ে অর্থশালী ক্ষমতাশালী জমিদার হ'য়ে কৌলীন্যের লোভে, পাত্র নিজে চক্ষে না দেখে তোমার উপর সব নির্ভর করেছিলুম, এই কি তার ফল? বেশ হয়েছে। নীলমণি, তুমি যাও।" বজ্রাগ্নির মত চৌধুরীর চক্ষু দুইটী জ্বলিতেছিল। নীলমণি সে ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে না পারিয়া মাথা নীচু করিয়া বহিল—"কর্ত্তা, আমি যে কত ক্লেশ করে এই পাত্র সংগ্রহ করেছি, তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেউই জানেন না—"

চৌধুরী মহাশয় গর্জ্জিয়া কহিলেন—"তুমি ঈশ্বরের নাম করো না নীলমণি; তা হ'লে ঈশ্বরের আসন যে টলে যাবে। তোমার ঈশ্বর ত টাকা। তা ত পেটে যথেষ্টই পূরেছ।"

নীলমণি সাতপুরুষে ঘটক। সে কিছুতেই পিছু পা হবার নয়। মৃদু স্বরে কহিল—"আপনি অসন্তুষ্ট হচ্চেন, কিন্তু অবিশ্যি আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, তবে বাবাজীর যে রোগা শরীর দেখ্‌ছেন, ও ম্যালেরিয়ার দরুণ। গরীবের ছেলে তেমন চিকিৎসা বা চেষ্টা যত্ন ত আর হয়নি, এখন আপনার হাতে এল;—সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবেন ছমাস পরে বাবাজীর চেহারার জৌলস কি রকম ফুটে বেরোয়। অদৃষ্ট আর ভবিতব্যের বিধান এদুটো কথা যদি আপনিও ভুলে যান, তাহ'লে যে আর আপশোষ রাখবার জায়গা থাক্‌বে না।"

চৌধুরী মহাশয় খানিক চুপ করিয়া রহিলেন;—তারপর

কহিলেন "তুমি এখন বাইরে যাও, আমি একটু চিন্তা ক'রে দেখি।"

এইরূপ নানা জনের মুখে নানা কথা নানা ভাবে প্রচারিত হইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া পঁহুছিয়াছিল। নিরুপমার যশোদা নামে একটী প্রৌঢ়া ঝী ছিল। এই ঝী তাহার মায়ের আমলের ;—সে নিরুপমাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। নিরুপমার যত আদর আবদার সে যেমন সহ্য করিয়াছে, এমন কেহই করে নাই। যশোদা নিরুপমার বিবাহ দেখিবার জন্য বহুদিন হইতেই অতিমাত্রায় উৎসুক ছিল। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বর কবে আসিবে, সে ভাবনায় তাহার অনেক দিন অনিদ্রায় কাটিয়াছে। যশোদা বাহিরে বর আসিবার রব শোনা মাত্রে ছুটিয়া বাহিরে যাইয়া বর দেখিয়া আসিল। বর দেখিয়াই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। জ্ঞান হীনা মূর্খ যশোদা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া আসিয়া মাধুরীদেবীকে কহিল—"হ্যাঁগা। বিমাতা কি সত্যসত্যই এমন ডাইনী হয়! ছিঃ ছিঃ! কি সর্ব্বনাশ কল্লে, এমন রোগা বর কোথা থেকে জুটিয়ে আন্‌লে ?" মাধুরীর পাশে নিরুপমা তখন দাঁড়াইয়াছিল। যশোদা সেদিকে লক্ষ্য করে নাই, কিংবা সে যে নিরুপমার কাছেও একথা শুনাইতে ইতস্ততঃ করিত তাহাও সম্ভবপর নহে। মাধুরীর প্রফুল্ল মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। সে কহিল "যশোদা দিদি কি ক্ষেপ্‌লে নাকি ?"

যশোদা গর্জ্জিয়া কহিল—"হাঁ, আমি ক্ষেপেছি বই কি ?

তোমরা কি ক্ষেপনি, না? একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখ, দিদিমণির জন্য কোথা থেকে কোন্ ঘাটের মড়া আগ্‌লে এনেছ। ছিঃ ছিঃ, কথায় যা বলে সত্যি, বিমাতা মানুষ হয় না ডাইনী।" নিরুপমা হঠাৎ যে কখন মাধুরীর পাশ হইতে সরিয়া গেল, মাধুরী নিজেও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মাধুরী নিরুপমার চেয়ে চার পাঁচ বৎসরের বেশী বড় নয়। আর মাধুরী সত্য সত্যই মানুষটী বড় ভাল। সরলা—নির্ব্বিরোধা কেবল একটু চঞ্চলা এবং রঙ্গরস-প্রিয়া। যশোদার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল— "যশোদা দিদি! নিরু' বিবাহের কোন সংবাদইত আমি জানি না, আমায় কেন মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ?"

"জাননা, কর্ত্তা তোমায় কি একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই?" ছোট ছেলে মেয়েদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিলে তাহারা যেমন ভাঙ্গাগলায় ধীর স্বরে "না" বলে, মাধুরীও যশোদার অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া এবং ঐরূপ অযথা আক্রমণ সহিয়া ধীর স্বরে কহিল 'না'।

যশোদা মাধুরীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সে দেখিত এই মেয়েটী জমিদার-গৃহিণী হইয়াও বড় সরল ও কোমল। কোন বড় ঝঞ্জাটে সে থাকিতে চাহে না। যশোদার প্রাণ গলিয়া গেল, সে সুরটা নামাইয়া কহিল—"আচ্ছা, তুমিই বিচার কর বৌমা! এমন চাঁপার কলির মত সুন্দর মেয়েকে কি এমন করে বিসর্জ্জন দিতে হয়। এত আর গরীব দুঃখীর

মেয়ে নয়। আজ যদি ওর মা বেঁচে থাক্‌তেন, তাহ'লে কি কথ্‌খনো এমন হ'তে পার্‌তো? নিরুদিদির মা নেই, এখন তুমিই তার মা, তুমিই তার সব। যে ক'রে পার কর্ত্তাকে ব'লে এর একটা বিহিত করো।" এইকথা বলিয়া যশোদা নিরুপমার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

মাধুরী দেখিল নিরুপমা তাহার পাশে নাই। সে নিরুপমার উপস্থিতিতে যশোদা তাহাকে এতগুলি কথা বলিয়া গেল বলিয়া যেরূপ শঙ্কিত ও লজ্জিত হইয়াছিল, এখন তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নিরুপমার শোয়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিল নিরুপমা বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে মাধুরী যাইয়া তাহার পাশে বসিল, ধীরে ধীরে তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। তারপর দু'জনে কি কথা হইয়াছিল, তাহা ত আগেই বলিয়াছি। মাধুরীদেবী—বিমাতা হইলেও সমবয়স্কা সতীন্‌ কন্যা নিরুপমাকে ভালবাসিতেন, মাধুরীদেবী নিরুপমার সহিত নানা কথাবার্ত্তারই আলোচনা, করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধ কতকটা সখীর মতন ছিল— বিমাতা ও সপত্নী কন্যার মত নহে, কাযেই মাধুরীর প্রাণ নিরুপমার জন্য সত্যসত্যই কাঁদিয়াছিল।

এত বাধা বিপত্তির মধ্যেও বিবাহ হইয়া গেল। অনিল পূর্ব্ব হইতেই এমন অদ্ভুদ ব্যাপার ঘটিতেছে শুনিয়া পিতাকে নিষেধ করিয়া পত্র দিয়াছিল, কিন্তু উত্তরে সে নির্ম্মম বাণী

শুনিতে পাইল, তখন সে আর এ বলিদান দেখিতে অগ্রসর হইল না। রামলাল মুখুয্যে, নীলমণি ঘটক ও বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ম্যালেরিয়া নামক ব্যাধি যে কিছু নহে, একটু সেবা শুশ্রূষা এবং চিকিৎসাপত্র চলিলেই বাবাজী সুস্থ সবল হইয়া উঠিবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, এরূপ অবস্থায় অনন্যপূর্ব্বা কন্যার অন্য গতি নাই, বিশেষ শাস্ত্রে পাতিত্য দোষ লিখে। চৌধুরী মহাশয় বজ্রগর্ভ মেঘের মত নীরবে রহিলেন— বিবাহ হইয়া গেল। হিন্দুসমাজের কন্যা সে বড় ঘরেরই হউক আর মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই হউক বা দরিদ্রেরই হউক, তাহাদের সমাজে কতটুকু মূল্য? ঢাক ঢোল বাজিল—সানাই বাঁশীর লহরী ছুটিল—বিবাহ হইয়া গেল। রোগজীর্ণ সুবোধের বিবাহের আসনে বসিয়াই জ্বর আসিয়াছিল, মুখচন্দ্রিকার সময় নিরুপমার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিবাহ হইয়া গেল—মৃত্যুর বিকট হাসি আনন্দের চপলা জ্যোতির মাঝখানে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—অন্যে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই কিন্তু সুবোধের সেই মৃত্যু-দূতের পরিচয় হইতে বিলম্ব ঘটে নাই।

৮

সুবোধের জ্বর তিনদিন যাবৎ খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। সহর হইতে তিন চারজন ভাল চিকিৎসক ও সাহেব ডাক্তার আসিয়াছেন। চিকিৎসা চলিতেছে। রামলাল মুখোপাধ্যায়

দেনা পাওনার টাকা পয়সা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া—কখন যে পীড়িত পুত্রকে ফেলিয়া রাখিয়া চম্পট দিয়াছেন কন্যাপক্ষের কেহই সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখেন নাই। বরযাত্রীর দল ত বিবাহের পরদিন প্রাতেই একটা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; তাহাদিগকে ত আর দোষ দিবার কিছু ছিল না, সকলে বরং এরূপ অস্বাভাবিক ও অজানিত ঘটনায় ম্রিয়মাণ থাকায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহারা এমন অমানুষিক ব্যবহারে সকলেই রামলালের উপর চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু একটা বিপদ যে এত শীঘ্রই ঘটিতে পারে এমন আশঙ্কা পূর্ব্বে কেহই করেন নাই।

নিরুপমার স্থলপদ্মের মত সুন্দর মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে ত পূর্ব্ব হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যে এত' তার বিবাহ নয়, এ যে মরণকে বরণ করিয়া লইয়া চিরজীবনের জন্য বিষাদ-মূর্ত্তিরূপে তাহাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। উপরে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে সুবোধ রোগশয্যায় শায়িত,—অনিল বিবাহের পরদিনই ভূপতির চিঠি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছিল। এই সুবোধের সঙ্গে সে দু'বৎসর একসঙ্গে কলেজে পড়িয়াছিল। অনিল সুবোধকে প্রথমে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, সে বিস্মিত হইয়া কহিল—"সুবোধ, তুমি ?" সুবোধ—অশ্রুভরা-চোখে কাতরদৃষ্টিতে কহিল—"হ্যাঁ ভাই, আমি। আমি যদি পূর্ব্বে জান্‌তেম—না—যাক্ সে কথা—ভাই আমাকে ক্ষমা কর।" অনিল কাঁদিয়া

ফেলিল—তাহার প্রাণে গভীর বেদনা আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, অনিল কহিল—"ভাই, সংসারে এমন অনেক কায হয়, যার উপর মানুষের কোনও হাত নাই, বাবা, সমাজের দিকে চেয়ে"—অনিল নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল—"সুবোধ! তুমি সুস্থ হবে, আমরা তোমার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণ কর্‌বো,বাবা অর্থের ব্যয় কর্‌তে এতটুকু ইতস্ততঃ ক'র্‌বেন না।"

সুবোধ হাসিল—প্রদীপ নিবিবার আগে যেমন একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি লইয়া জাগিয়া উঠে এ হাসি তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি ভীষণ। সুবোধ কহিল "ভাই, আমি আমার এই রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কোন মতেই বিবাহ ক'র্‌তে রাজি হইনি, তবে বাবার আদেশ-বাক্য শেষটা কোন মতেই লঙ্ঘন কর্‌তে পাল্লুম না, তারপর ভেবেছিলুম হয় ত তেমন ভাবে যত্ন চেষ্টা কর্‌লে আমি ভাল হব; আবার স্বাস্থ্য ফিরে পাব। কিন্তু এখন—এখন আমার আর সে আশা নেই, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—কি ভুল করেছি—কি ভুল করেছি, একটী স্বর্ণলতিকাকে চিরজীবনের জন্য অন্ধকারে ফেলে গেলুম।"

অনিল কোন কথাই বলিতে পারিতেছিল না, সে অতি মৃদুস্বরে কহিল—"তুমি এ সব ভেব'না সুবোধ। তুমি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করবে। সুবোধের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, সে আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিল।

শশীবাবু জামাতাকে দেখিতে শুধু একবার ভোরে আসিয়া-

ছিলেন। তারপর আপনার ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া স্তম্ভিতের মত কি যে ভাবিতেছিলেন, তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারই বড় একটা ছিল না। কখন যে এই মুমূর্ষুর জীবনের দীপটুকু নিবিয়া গিয়াছে—এই দুঃসংবাদ আসিয়া তাহার কাণে পঁহুছিবে এই আশঙ্কাটুকু প্রতি মুহূর্তেই তাঁহার মনে আসিতেছিল। তবু তিনি ধীর গম্ভীর নিশ্চল হিমানী-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের মত শত ঝড় ঝঞ্ঝনা সহিবার জন্যই যেন প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

চিকিৎসক রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া সুবোধকে ডাকিয়া কহিলেন—'রোগীর জীবনীশক্তি মাত্রই নাই, অতি কষ্টের সহিত বলিতে হইতেছে যে বোধ হয় আজ শেষ রাত্রিতেই উহার সব শেষ হইয়া যাইবে!' চিকিৎসকের এত বড় একটা কথা বলিতে বিন্দুমাত্রও কোন বিমর্ষভাব লক্ষিত হইল না। যাহাদের হাত দিয়া এমনি ভাবে শত শত পরিবারের কত সোণার প্রদীপ অকালে নিবিয়া যায় তাহারা মৃত্যুকে তেমন একটা ভীষণ বলিয়া মনে করে না। চিকিৎসক আরও কহিলেন—'আমি এখন যে ঔষধটা রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম তাহাতে তাহার জীবনীশক্তি একটু সঞ্জীবিত হইবে। এবং হয়ত সে দুই একটী কথাও বলিতে সক্ষম হইবে, আপনার ভগ্নীকে সে সময়ে একবার রোগীর নিকট উপস্থিত করিতে পারেন। হাজার হলেও—স্বামী। আমি নীচে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি।' রোগীর জীবন রক্ষা পাইবার জন্য আন্তরিক

চেষ্টা যত্ন থাকিলেও—পুরস্কারের একটা প্রলোভন থাকিলেও—তাহা পাইবার যে কোন আশা নাই, শুধু দৈনিক হাজার টাকার জিনিষটা পকেটে ঘুরাইয়া তাহাকে বিক্রয় হইতেহ ইবে। এ কাথাটা বাঙ্গালী ডাক্তারসাহেব বিশেষ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

মাধুরীদেবী ও সহর হইতে আগতা নার্সটা' প্রাণ দিয়া রোগীর সেবা করিতেছিলেন। এ দু'তিনদিন তাহাদের আহার নিদ্রা একরূপ ছিলই না। সুবোধ সমস্ত রাত্রি ছট্ফট্ করিয়া কাটাইতেছিল। রোগের যন্ত্রণা নানাভাবে তাহার দেহে প্রকাশ পাইতেছিল। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, জ্যোছনা পশ্চিমে নারিকেল গাছের পাতার আড়ালে ঝি কি মিকি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে—চন্দ্রের সঙ্গে একখানা কালো মেঘ লুকোচুরি খেলিতেছে—এই আলো নিভিয়া গেল, এই আবার মেঘের আড়াল দিয়া চন্দ্রের সুধাধবল অমল জ্যোছনারাশি ফুটিয়া উঠিল; বাহিরে ঝির্ ঝির্ তির্ তির্ করিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। দুই একটা নিশাচর পাখী মাঝে মাঝে বিকট গম্ভীরনাদে হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া যাইতেছে। বাহিরের এই ভীষণ স্তব্ধতার মাঝখানে যখন আলো ও আঁধারের ভিতর একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—উষারাণীর সহচরেরা নিশীথিনীকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আলোকের কনকধারা বিকীরণ করিয়া আলোকদূত প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল—তখন জীবন ও মরণে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল।

সুবোধ নয়ন মেলিয়া যেন কাহার দিকে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ডাক্তার একখানা ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শুইয়া রোগীর গতিবিধির লক্ষ্য করিতেছিলেন, ত্রস্ত রোগীকে একটা ঔষধ সেবন করাইয়া, অনিলকে কহিলেন—'এইবার আপনার ভগ্নীকে নিয়ে আসুন।'

মাধুরীদেবী নিরুকে সেখানে লইয়া আসিলেন—শুধু অনিল মাত্র সেখানে রহিল। সুবোধ—অতি কষ্টে হাতখানা কাঁপাইতে কাঁপাইতে নিরুপমার কোমল করপল্লব গ্রহণ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল—"আমাকে ক্ষমা করিও—আমি যে অপরাধ করিয়াছি—তার মার্জ্জনা—ঈশ্বরও আমায় করবেন না। তুমি—আমাকে ক্ষমা কর—"

নিরুপমা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু বহিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া সুবোধের রোগ-জীর্ণ শীর্ণ করতল সিক্ত করিয়া দিল। সেও কি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছিল? মৃত্যুর কোলে শুইয়া তাহার এই চির বিদায়ের অশ্রুরাশি যে কত বেদনাময়—কত যন্ত্রণাময় তাহা কে বুঝিবে। সুবোধ অনিমেষ নয়নে নিরুপমার দিকে খানিক নীরবে চাহিল—ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া অনিলকে কহিল—"ভাই, যাই—আমার অনুরোধ—অনুরোধ কেন আদেশ—এ আদেশ করিবার অধিকার আমি মৃত্যুর কোলে শুইয়া পাইয়াছি বলিয়াই মনে হয়—তোমার ভগ্নীর আবার বিবাহ দিও।" নিরুপমার মাথাটা হঠাৎ রুগ্নের মাথার

কাছে লুইয়া পড়িল।” সুবোধ আর কোনও কথা বলিতে পারিতেছিল না—তাহার সারা দেহ কম্পিত করিয়া ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল, সারা দেহ কাঁপিতেছিল, চিকিৎসক দৌড়িয়া আসিয়া নাড়ী দেখিয়া মুখ বিকৃতি করিলেন, দ্রুত ঔষধ দেহে পূরিয়া দিলেন। কিন্তু রোগী আর নয়ন মেলিল না। প্রভাতের সোণালী আভা যখন গগনের গায় চির নূতন শোভার বিকাশ করিয়াছে—তখন সেই সোণার পুষ্প-রথের আলোর গতিতে একটী নির্ম্মল আত্মা কোথায় কোন্ অজানা দেশে নীল গগনের কোন্ সুদূর পারে মিলাইয়া গেল তাহার সন্ধান কে আর বলিবে বল। এইত জীবন—এইত মানবের শত সুখ আশার গড়া সোণার স্বপন। পাখীর কাকলির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রন্দনের করুণ-রাগিণী-ধ্বনিত হইয়া উঠিল—একটী জীবনের সহিত আর একটী বালিকা-জীবন অন্ধকারে ডুবিল—আশার দীপ নিবিয়া গেল।

৯

বিধাতার বিধান লইয়া চিরদিনই পৃথিবীর নর-নারী তর্কের জাল বুনিয়া আসিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর নানা সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যখন দেখিতে পায় সংসারের প্রিয়তম যাহারা—তাহারা একে একে বুকে বজ্র হানিয়া ঝরিয়া পড়ে—তখনি মানব উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠে ঈশ্বর মিথ্যা—ঈশ্বর নাই! এই ভাবে প্রতি

ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মধ্যে প্রাত্যহিক মঙ্গল অমঙ্গলের মধ্যে আমরা শতবার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি আর শতবার ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি। ঈশ্বরে বিশ্বাসী—সুখে দুঃখে-শোকে দৈন্যে অখণ্ড নির্ভর আমাদের কোথায়?

নিরুপমা বিধবা হইবার পর কয়েকটা দিন খুবই একটা শোকের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল—এখন চারি পাঁচ বৎসর পরে সে শোকের বেদনা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। গরীবের প্রাণে শোকের আঘাত দুইদিক্ দিয়াই প্রবল হয়, প্রথমতঃ অর্থের অভাবে দুইদিনের ভিতরই জীবিকাসংগ্রহের প্রবল তাড়নায় শোকের অরুন্তুদদহনি বুকে করিয়া জনসমাজে চলা ফেরা করিতে হয়, কিন্তু ধনীর সে ভাবনা নাই, তাহার পক্ষে শোকের অভিনয় অনেক দিন চলিতে পারে।

বড় ঘরের কথা। নীলমণি ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের প্রকোপে পড়িয়া আজ কাল কাশীবাসী। তাহার পক্ষেও নেহাৎ মন্দ হয় নাই,—কারণ জমিদারের বাড়ীর বিবাহের নানা ব্যাপারে সে জড়িত থাকিয়া দুইটী প্রাণীর পক্ষে সে কয়েক হাজার টাকা সে সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার দ্বারা অনায়াসেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনটা কাটিয়া যাইবার ব্যবস্থা তাহার হইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় বরাবরই তন্ত্রমতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার ভক্তির মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে,—কাশী হইতে একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে নানা যোগ-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ দিয়া—

ইতিমধ্যেই জগতের মঙ্গলের জন্য কয়েকটি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহাতে পঞ্চ-মকারের কোনটিরই অভাব হয় না। কেহ যদি কোনদিন চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিত 'আপনি কেন এ সব কাযে অনর্থক অর্থের অপব্যয় কচ্ছেন?' তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন—বলিতেন—"প্রাণের আগুন জ্বলে উঠে তাই জল ঢালি আর ঈশ্বরের নামে যা কিছু একটা করি।" সিদ্ধপুরুষের আদেশ মানিয়া চলিতে চলিতে এবং বহুদিন নিরম্বু উপবাস ও কারণ সেবনের ফলে তাঁহার শরীরখানি তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, সে লাবণ্য শ্রী আর তাঁহার ছিল না। সিদ্ধপুরুষের আদেশে তিনি জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গ্রামের যে সমস্ত ইতর লোক, পূর্ব্বে কোন দিন জমিদারের নিকট আসা দূরে থাকুক—সহস্র হস্ত দূরে দেখিলেই পলায়ন করিত, এখন তাহারাই তাঁহার সঙ্গী।

সাধু সন্ন্যাসীর নিকট কোন দিনই আমাদের দেশের কুলবধূদের লজ্জার বাঁধন থাকে না। সিদ্ধপুরুষের নিকট কত নারী যে কত দুঃখ দৈন্য ও ঔষধ কবচের জন্য আসিতে-ছিল তাহার অবধি ছিল না। সাধু প্রচার করিয়া দিয়া-ছিলেন যে যদি কোন বন্ধ্যা নারী তিন রাত্রি তাহার আশ্রমে বাস করে তাহা হইলে সে সন্তানবতী হইবে। ফলে—প্রত্যহ একজনের বেশী মহিলার আশ্রম বাসের আদেশ ছিল না বলিয়া কে পূর্ব্বে আসিয়া আশ্রম-বাস করিবে,—তাহার জন্য

বন্ধ্যা রমণী-মহলে একটা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল। সাধুর বাড়ী কোথায় বা বয়স কত তাহা লইয়াও কত দিন কত আন্দোলন চলিয়াছে। তবে তিনি যে পশ্চিম দেশবাসী তাহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে সিদ্ধতন্ত্রমঠ স্থাপন করিয়া লুপ্তপ্রায় তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্যই তাঁহার এইবার বঙ্গদেশে আগমন। তিনি যখন এই গ্রামে শুভাগমন করেন, তখন ছিল তাঁহার দীর্ঘ জটাজুট সমন্বিত জীর্ণ-শীর্ণ দেহ—এখন তাহা নধর সুন্দর লাবণ্য প্রভায় ঢল ঢল করিতেছে। বাহিরে যখন এইরূপ অবস্থা তখন একটু অন্দরের কথা লইয়া আলোচনা করা যাউক। মাধুরী দেবী এখন স্বামীর বড় একটা দেখা পান না—যদিই বা কালে ভদ্রে তিনি কখনও সদর হইতে অন্দরে আসেন তাহা হইলেও বড় একটা সজ্ঞানে আসেন না। পুত্র অনিলকুমার এখন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, তাঁহার কাণে এখনও এদিকের সব কথা পৌঁছায় নাই। অনিল—নিরুপমার বিধবা হইবার অল্পদিন পরেই পিতাকে কহিয়া আবার নিরুপমার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। শশীবাবু এই দুর্ঘটনার পর হইতে পারিবারিক কোন বিষয়েই আর কোন কথা কহিতেন না, তিনি অনিলকে শুধু এই একটী কথা বলিয়াছিলেন—"বাবা, নিরুপমার যাতে জাতি, কুল মানটা থাকে, আমার গর্ব্বিত শির নীচু না হয়, শুধু তুই ঐ'টুকু দেখিস্—আর আমি কিছুই চাইনা।" অনিল সংকল্প করিয়াছিল

নিরুপমাকে উপযুক্তরূপ সুশিক্ষিতা করিয়া তাহার বিবাহ দিবে। বালবিধবার পক্ষে সারা জীবন নিরাশায় তপ্তশ্বাসে দহিয়া মরণ অপেক্ষা—কিংবা কোন সমাজ বিগর্হিত পাপকে গোপনে প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা বিবাহ যে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ—কিন্তু তাহার এই গোপন মনের ভাব ভূপতিকে ছাড়া কাহাকেও বলে নাই, ভূপতিকে সে বন্ধু হিসাবে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, জগতে সে এমন ভাবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কাহাকেও কোন দিন করে নাই। পিতার—বিশেষতঃ জমিদার পিতার খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে চতুর জমিদার-নন্দনেরা কোন দিনই কোন আপত্তি তোলেন না, এটা ভীরুতা বা দুর্ব্বলতা বলিতে পার, কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ফলে পিতা পুত্রকে বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনিল এসব নানাদিক্‌ বিবেচনা করিয়াও মাঝে মাঝে পিতার খামখেয়ালির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে অগ্রসর হয় নাই, দু'একবার অযাচিত ভাবে বলিয়া দেখিয়াছে যে তাহাতে পিতা অসন্তুষ্ট বই বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট হন না। এইরূপ ক্ষেত্রে নীরবতাই হইতেছে সর্ব্ববাদী সম্মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাধুরী দেবীর মধুর ব্যবহারে নিরুপমা স্বামীর বিয়োগ-ব্যথাটা যেন তেমন করিয়া বুঝিতে পারে না। তিনি নিরুপমাকে থান কাপড় পরিতে দেন নাই, অলঙ্কার খুলিতে দেন নাই—শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন বিধান যেখানে চলে না, সেখানে তিনি কোনরূপ হাত দেন নাই। নিরুপমার

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যৌবন তাহাকে শতরূপে শত ভাবে সাজাইয়া তুলিয়াছে—চোখের চঞ্চল দৃষ্টি, তরঙ্গায়িত এলোকেশে আষাঢ়ের মেঘের মত রূপ-লহরী—ধীরমন্থরগতি নিরুপমাকে অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রীতে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। ভূপতি ভোরে ও সন্ধ্যায় দুইবেলা আসিয়া তাহাকে গান বাজনা, লেখাপড়া ও চিত্র শেখায়। ভূপতি ভাল গাহিতে ও বাজাইতে পারিত, চিত্র-লেখাও সে শৈশব হইতেই অভ্যাস করিয়াছিল, এক কথায় সে ললিতকলার দিক্ দিয়া অনেক জিনিষই নিজ করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। নিরুপমাকে সে শিখাইত, প্রাণ দিয়া শিখাইত, নিরুপমার এই মরুভূমির মত নিরাশাভরা জীবনের কথা চিন্তা করিয়া কতদিন সে গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে—সুবালার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, সুবালা স্বামীর এই আন্তরিক সহানুভূতিতে ব্যথিত হইয়া সমবেদনা জানাইয়া কহিয়াছে—"আহা! যদি নিরুপমার তোমার সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি সুন্দরই না মানাইত!" ভূপতি কোপ প্রকাশ করিয়া কহিত—"কি যে বল ছাই!"

"কেন, কোনও অন্যায় কথাত বলিনি তোমায়, সত্যি, কিন্তু বেশ হত।'

"আহা! সে সত্যিত হয় নি—আর সে কথা তুলে কি লাভ?"

"নিজের হাতে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত গড়ে তুলে ছিলে, দুজনে কত সুখী হতে—কত ভাল কায করতে পারতে

সমাজ কিনা সেইসাধে বাদ সেধে দিলে ; যত ছাই আমাদের সমাজের হাঙ্গামা !"

"যাও মিছে বকোনা, শুন্‌ছো তোমার তৈরী খদ্দরের বাজারে কেমন সুনাম পড়ে গেছে—আমি ভাবি তাইত, তুমি সংসারের এত কায করে কোন্ সময়ে সূতা কাট, কাপড় বুনো। আমি ভাগ্যবান তাই তোমাকে স্ত্রী পেয়েছিলুম !" এমনি দুইটি সোহাগের বাণীতে সুবালা আপনাকে স্বামীর সুগোল বলিষ্ঠ দুইখানি বাহুর মাঝখানে বাঁধা দিত। ভূপতির একটা চুম্বনে তাহার সারা দেহে তড়িৎ খেলিয়া যাইত। তবু কিন্তু মাঝে মাঝে সুবালার মনে এ কথাটা জাগিয়া উঠিত—হায় ! কুরূপা আমি, কোন মতেই স্বামীকে সুখী করতে পারলুম না। খোকা এখন বড় হইয়াছে, সে এখন একটু হাঁটিতে পারে—মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। মাঝে মাঝে যখন সে বলে—"মা দাদু আমার বিলাতি কাপল পল্‌তে দিয়েছিল, আমি কেন বিলালি কাপল পলব—আমি মা তোমাল চলকায় কাটা সুতোল লাল পেলে কাপল পল্‌বো।" তখন সুবালার প্রাণে কোন বেদনা—কোন দুঃখ থাকিত না। সে মনে করিত, এমন দেবতার মত স্বামী আমার—আমি কিনা তার প্রাণে দুঃখ দিই, খোকা আমার বেঁচে থাকুক। কিসের আমার কষ্ট।

ভূপতির সংসারেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পিতামাতা দুইজনেই ছেলের কাছে সজ্ঞানে ঈশ্বরের নাম স্মরণ

করিতে করিতে পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। এখন সুবালা এবং ভূপতির পিসীমা সংসারের কর্ত্রী বা গৃহিণী সব। ভূপতির সংসারে এখন আর কোন দুঃখ দৈন্য ছিল না, সুবালার সযত্ন গৃহিণীপণায় কিছু সঞ্চয়ই বরং হইয়াছিল। ক্ষেতের ধানে—ক্ষেতের ফসলে বারমাসের প্রয়োজনীয় অভাব দূর হইত। বাড়ী ঘরের শ্রী সাজসজ্জা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গ্রামের লোকের আদর্শ হইয়াছিল। পল্লী রমণীরা দুপুরের সময় অনেকেই সুবালার ওখানে আসিতেন, চরকায় সূতা কাটিতেন, ভাল ভাল গল্প শুনিতেন, স্বাস্থ্যের দুইচারিটি নূতন কথা শিখিতেন। ধীরে ধীরে সুবালার চরিত্রের প্রভাব গ্রাম্য নারীযুবতী মহলে বিস্তারিত করিয়াছিল। স্বাস্থ্য বল, শান্তি বল, সমুদয়ই গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহিলাদের হাতে;—যেদিন তাহারা পূর্ণভাবে আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখিবেন, সেদিন আমাদের কোন অভাব অভিযোগই থাকিবে না, আবার মানুষ হইব।

আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলারা যখন সহরে মিটিং করিয়া নারী-সংস্কারের লম্বা লম্বা স্পিচ্ ঝাড়েন, তখন কি তাহাদের লজ্জা বোধ হয় না যে তাহারা দেশের পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা মহিলাদের জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কতটুকু করিয়াছেন? কয়জনে সুখের সহর বাস, বিলাসিতা মোটর গাড়ীর সুখ-অভিমান ছাড়িয়া আপনাদিগকে পল্লীরমণীগণের শিক্ষা-বিধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। দেশে যে ত্যাগ ও আদর্শের দিন আসিয়াছে, দেশ যে এখন কাজ চায়, তর্ক,

বিতর্ক চাহে না, দেশ যে এখন চায় ত্যাগী ব্রহ্মচারী ও ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। রূপরসশিক্ষাবিলাসিনী—হার্ম্মোনিয়ম পিয়ানো-বাদিনী রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতকারিণী—ঘন ঘন বেশ পরিবর্ত্তনকারিণী—এসেন্স-মণ্ডিতা—হারকালঙ্কার ভূষিতা রমণী চাহে না। হে সভাসমিতি আহ্বানকারিণী রমণীগণ! যদি দেশকে ভালবাস, যদি দেশের মাটীকে স্বর্ণধূলি বলিয়া সত্য সত্যই মনে কর, তাহা হইলে একবার ছায়ায় ঘেরা নদীর কূলে, ধানে ভরা মাঠের ধারে—কালো জলের কালো ঢেউ তোলা পুকুর পাড়ের সুপারি-নারিকেল-তাল-আম্র-পনসে বেষ্টিত গৃহস্থের কুটীরে পদার্পণ কর। বিলাতি লিলি দূরে ফেলিয়া স্থলপদ্ম তগর যুঁই বকুলের মালা কণ্ঠে দোলাইয়া দাও,—পায়ের ষ্টকিং ছাড়িয়া অলক্তক-রাগে শ্রীপদযুগল সুরঞ্জিত করিয়া মাটিতে পা দুখানি ফেলিয়া দরিদ্রা পল্লীবধূকে আলিঙ্গন করিয়া বল—'সখি, বন্ধু! আমি এসেছি'—তবেই সংস্কার সার্থক হইবে—দেশের পুণ্যসাধনা বিকশিত হইবে।

১০

বিলাতের কোন কোন বড় বড় ডাক্তার গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন ভালবাসা একটা রোগ—এই রোগের বীজাণুও নাকি তাঁহারা কয়েকজন প্রেমিক প্রেমিকার দেহের রক্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ভাল কথা, ভালবাসা যে রোগ তাহাতে

আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এই ব্যাধি চিরদিনই পৃথিবীর সেই আদি সৃষ্টি হইতে জগতের নর-নারীকে শত দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়াও শত জরা-মৃত্যুর মাঝখান দিয়াও অমর করিয়া গিয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস—ভালবাসার ইতিহাস। শকুন্তলা আজও অমর হইয়া জগতের নরনারীর কণ্ঠে কণ্ঠে বাঁচিয়া আছে—ভালবাসার বেদনা সহিয়াছেন বলিয়াইত, মানুষ কত বড় বড় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও রাজা রাজড়া বীরপুরুষের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কই ডেস্‌ডেমোনিয়া বা ওথেলোর কথা ত ভোলে নাই, জুলিয়েট রোমি-ওর আত্মোৎসর্গের কাহিনীত স্মৃতি পথ হইতে দূর করে নাই, শ্রীরাধিকার মান-অভিমান বিরহ-বিয়োগ ব্যথার বেদনার জ্বালা ত প্রতিনিয়ত না কহিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

নিরুপমার প্রাণে যদি ভালবাসার কথা জাগিয়া উঠে তাহা হইলে তোমরা কি তাহাকে দোষ দিতে পার ? মানুষের যে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যৌবন যখন দেহে সুরের ঝঙ্কার জাগাইয়া দেয়—রূপ যখন আপনা হইতেই ফুটিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করে তখন প্রাণ যে আপনা হইতেই ভালবাসিতে চাহে। পুরুষ তখন নারীর রূপে পাগল হয়—নারী আপনাকে বিস্মৃত হইয়া তখন আপনাকে মিলাইয়া দিতে চাহে। তখন তাহার চিত্তরাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, কে যেন আপনা হইতেই তাহার কণ্ঠে বাণী জাগাইয়া তোলে—এস ব্যথিত এস দয়িত—আমার এই মৃণাল কোমল বাহু বন্ধনীর মাঝখানে এস ; এই

আহ্বান কাহার সাধ্য উপেক্ষা করিতে পারে? কে সে এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর পুরুষ জগতে আছে বলিতে পার?

জমিদার বাড়ীর অন্দরমহলের বাগানখানি বড় সুন্দর। বাগানের ঠিক্ মাঝখানে একটী সুন্দর দীঘি। দীঘির জল বড় পরিষ্কার—নীল-নির্ম্মল। চারি ধারে সান-বাঁধা ঘাট। চারি পাড়ে ফুল ও ফলের গাছ। দেশী ও বিলাতী ফুল ও ফলের গাছের সারি বড়ই সুন্দর। চারি পার বেড়িয়া একটী লাল সুড়কীর তৈরী পথ বাহিয়া গিয়াছে। এখানে সেখানে লতাকুঞ্জ। চারি পারের চারি ঘাটের দুই পাশেই দুইটী দুইটী করিয়া বকুল গাছ। গাছগুলি এখন খুব বড় হইয়াছে। ফুলে ফুলে গাছ ভরিয়া গিয়াছে। এ গাছ কয়টীতে যত রাজ্যের সুকণ্ঠ বিহঙ্গের বাসা। এই চুপ করিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ শুনিলে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দোয়েল শিস্ দেওয়া সুরু করিয়া দিয়াছে। পাপিয়া ঝঙ্কার দিতেছে—কোকিল কুহু কুহু রবে সমস্ত বাগান প্রতিধ্বনিত করিয়া শত বিরহের সঙ্গীত গাহিতেছে। স্থানটি বড় নির্জ্জন। পুণ্যবতী অনিলের মাতা স্বামীকে বলিয়া কহিয়া বড় সাধ করিয়া এই বাগানখানি করিয়াছিলেন। তিনি কতদিন স্বামী ও পুত্রগণের সহিত এ বাগানের ফুল তুলিয়া ফল পাড়িয়া দশজনকে খাওয়াইয়া প্রীতি বোধ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এ বাগানের জন্য কেহ তেমন একটা যত্ন করে না। চৌধুরী মহাশয়ত ভুলেও এ বাগানে পদার্পণ করেন না। এখন খিড়কীর প্রাচীরের

ক্ষুদ্র দরোজাটা দিয়া কুলবধূরা এখানে প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় কাপড় কাচিতে আসে, গল্প—গুজব করে, জলে ঢেউ তুলিয়া—কলসী নাচাইয়া নিঃসঙ্কোচে নিজেদের সুখ দুঃখের গোপন কথা কহিয়া খানিকক্ষণের জন্য এই নির্জ্জন কানন ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যার প্রদীপটি ঘরে ঘরে জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে চলিয়া যায়।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। সেদিন গরমটা একটু বেশী পড়িয়াছিল। নিরুপমা ঘরে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। একবার গ্রামোফোন্‌টায় চাবি দিয়া গান শুনিতে আরম্ভ করিল। একজন সুকণ্ঠ মহিলার ধৃত কণ্ঠ হইতে গীত হইতেছিল—

‘সে যে মানে না মানা,
মুখ ফিরাইয়া বলে না-না-না—’

ভাল লাগিল না। বন্ধ করিয়া দিল। আর একটা রেকর্ড তুলিয়া দিল বজ্রকণ্ঠে গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিতেছেন—"তুমি কি রোহিণী! রাজার অধিক ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ অকলঙ্ক চরিত্র সব তোমার জন্য বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম—তুমি কি?" সে সবগুলি কথা শুনিল, হঠাৎ তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। গ্রামোফোন সরাইয়া রাখিল। তারপর একটা গানের স্বরলিপি দেখিয়া বাজাইতে চেষ্টা করিল—ভাল লাগিল না, কেবলি ভুল হইতে লাগিল। টেবিলে ছড়ান ইংরেজী বাঙ্গালা পুঁথি পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিল—কিন্তু কোনটাতেই মনোনিবেশ করিতে পারিল না। বেলা যে

কিছুতেই পড়িতেছে না। মাধুরী দেবীও কি একটা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ আর এ দিকে আসিতে পারেন নাই। নিরুপমার ভূপতির উপর বড় রাগ হইল। আজ শনিবার দিন, তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, ভূপতি দাদা স্কুল ছুটির পর ত অনায়াসেই আসিতে পারিতেন; বেশ লোক একটুকু অবসর হলো না, এলে কিন্তু বেশ হত; নানা গল্প-গুজবে সময়টা কাটাইয়া দিতে পারিতাম। তার পর বেলা পড়িয়া গেলে সে একাকী বাগানের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল। সেখানটা তাহার কাছে বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল—দীঘির জলে স্নান করিয়া শান্ত শীতল বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। একটা প্রস্ফুটিত লতাকুঞ্জের মাঝখানে—একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, শরীরটা এলাইয়া দিয়া সে সেখানে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নানা আকাশ পাতাল জল্পনা করিতে লাগিল। কখন যে সন্ধ্যা হইয়া গেল—কখন যে পূর্ব্ব দিক্ আলো করিয়া পূর্ণ চন্দ্র আকাশে দেখা দিয়াছেন সেদিকে আদৌ তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না।

১১

ভূপতির এখন অনেক কাজ। স্কুলের কাজ, গ্রাম্য সভা সমিতির কাজ, তার উপর দেশ-জননীর সেবার কাজ। ভূপতির স্বভাবটি চিরদিনই মৃদু কোমল অথচ দৃঢ় ছিল। সে যে কাজ করিত তাহার দশদিক্ বিবেচনা করিয়া তবে তাহাতে অগ্রসর হইত। অসহযোগ আন্দোলনের সবটা সে পছন্দ করিত না।

তাহার স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ছিল একটু উগ্রপন্থী—অবশ্য বচনে। তাহারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত সময়ে সময়ে তাহার সমক্ষেও কহিতে ইতস্ততঃ করিত না যে—'ভূপতি একজন খয়ের খাঁ।'

ভূপতি মৃদু হাসিয়া কহিত—"মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ বাণী যদি আমি কিছু বুঝিয়া থাকি তাহা হচ্চে এই ত্যাগ ও কর্ম্ম। বক্তৃতা বা বিদ্বেষ কর্‌বার মত কোন শক্তি আমাদের নাই।"

"কেন নাই ?" এই তর্কের উত্তরে ভূপতি বলিত—"আজ যদি আমরা বক্তৃতা না দিয়া প্রত্যেক গ্রামে চর্‌কার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া প্রকৃত কাজের দিকে অগ্রসর হতেম, তাহা হইলে আমাদের অভাব ধীরে ধীরে দূর হ'ত। ধরুন না আমাদের গ্রামের কথা, প্রথম যখন চরকার কথা উঠলো, গ্রামের প্রাচীনারা বা নবীনারা কেউ ত চরকায় সুতো কাট্‌তে রাজি হননি, কিন্তু যখন দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর রমণীদের মধ্যে চরকা বিলি করে দিয়ে সুতোর পরিমাণানুযায়ী দর দিতে সুরু করে দিলুম, তারা বুঝতে পাল্লে এ ব্যাপারটা শুধু ঝুটমুট নয়। কই তখন ত তারা কোন বাক্যব্যয় করেনি, আর আজ পাঁচ শতের উপর চরকা চল্‌ছে, সহরেও ত সপ্তাহে পনের কুড়িখানা করে খদ্দর চালান দিচ্ছি। তাই আমার বিশ্বাস—শুধু হরতাল কল্লে হয় না, শুধু বক্তৃতা দিলে হয় না, হাতে কলমে কাজে লেগে গেলে সুফল হবেই।" এই খাঁটি প্রাক্‌টিকেল্ সত্য কথার বিরুদ্ধে আর

কেহ কোন কথা কহিতে পারিত না—কারণ প্রথম যখন ভূপতি ছেলেদের সঙ্গে লইয়া বাড়ী বাড়ী চরকা বিতরণের জন্য ঘুরিয়াছিল, তখন এই শিক্ষকেরা অনেকেই গর্জ্জন করিয়া বলিতেন—"মশাই, স্কুলের ক্ষতি হচ্চে, ও সব বাজে কাজ ছেড়ে দিন্।" এই কৌশলি শিক্ষকটি বাজে কাজ হাতে লইয়া ছিল বলিয়াই ছেলেরা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোন একটা বিভ্রাট বাধায় নাই।

ভূপতি এখন দিবারাত্রি কাজ লইয়া থাকিতেই ভালবাসিত। সারাদিনের অক্লান্ত শ্রমের পর বাড়ী যাইয়া সুবালার সহিত খানিকক্ষণ গল্পে স্বল্পে যে সময়টুকু যাইত, সেইটুকু আর নিরুপমাকে পড়াইতে যাইয়া যে ঘণ্টা দুই সময় যাইত তাহাই ছিল তাহার সারাদিনের শ্রমের পর আনন্দ পুরস্কার। স্ত্রীর কাছে ও নিরুপমার কাছে সে তাহার জীবনের আশা, উদ্যম, দেশহিতৈষণা, গৃহস্থালী, স্বাস্থ্যরক্ষা এসব নানা কথার আলোচনা করিয়া সুবালার প্রাণে সে যেমন একটা কর্ম্মপ্রবণতা জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিল,—নিরুপমার প্রাণে এখনও সে সুরের ঝঙ্কার জাগিয়া উঠে নাই। দুই সুরে বাঁধা দুইটী তার যেমন দুই বিভিন্ন রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, এও ঠিক্ তাই। একজন আলস্যহীনা কর্ম্মী, কর্ম্মের প্রফুল্লতা প্রাণে দেদীপ্যমান, আর একজন তৃষিত মদ্যপায়ীর মত আনন্দের রস বিলাসের মধুর মদিরা পানের জন্য বিভোর।

ভূপতির আজ বাড়ী ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। সুবালা সম্মুখে জলখাবার দিয়া বলিল—"আজ এত দেরী হল যে?"

ভূপতি হাসিয়া কহিল—"আজ যে আমাদের স্কুলের ছেলেদের খেলা ছিল।"

"তা হলে আজ আর নিরুকে পড়াতে যাচ্ছ না, না?"

"কেন যাব না? কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা আমি কোন মতেই ভাল মনে করি না।"

"সে বেশ কথা, কিন্তু কই একদিনও ত কর্ত্তব্যের হেলা হতে দেখিনি, বরং আজ একটু হলই বা। ক্ষতি কি?"

"না ক্ষতি কি? তবে—"

"আর তবের কাজ নাই, রান্না প্রায় হয়ে এল, খেয়ে দেয়ে শুয়ে বিশ্রাম কর, কাজ, কাজ, কাজ, বলি কাজ ত লেগেই আছে, শরীর রক্ষে করে তবে ত কাজ করবে?"

"না, আমি ত তেমন ক্লান্ত নই, ঘণ্টা খানেকের ভেতর পড়িয়ে আসছি।" সুবালা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। ভূপতির সেদিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। সে ত্রস্ত চায়ের বাটিটা একটু নাড়িয়া শেষ চুমুকে সামান্য যে চাটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা শেষ করিয়া জামা পরিয়া ছড়িখানা হাতে করিয়া জমিদার-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সুবালা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল, তার পর দৃঢ় কণ্ঠে কহিল "ভয় হয়, কি জানি পাছে কি হয়, যে ক'রেই হয় এই

পড়ানোটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। মানুষের ভুল হতে কতক্ষণ !'

স্বামী স্ত্রীতে যখন কথা হইতেছিল, তখন পিসীমা তুলসী তলায় প্রদীপ ও ধূপ ধুনা দিতেছিলেন। ভূপতিকে যাইতে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন "হ্যাঁ গা বৌমা, ভূপতি এখন আবার কোথায় গেল ? সেই ভোরের বেলা দুটী ভাত নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়েছে, সারাদিন দেখা নেই, আর আজ অমনি এসেই চলে গেল ? কেন বাছা যেতে দিলে ?"

সুবালা ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল—"পিসীমা ! তুমি কি ন্যাকা হলে নাকি ? বলি তোমার ভাইপো লোক আমার হাতে-ধরা নাকি ? নিজে কুলীনের মেয়ে, কুলীনের ঘরের বৌ ছিলে, কিছু জাননা ? এখন যে জমিদার-বাড়ীর নিরুকে পড়াবার সময়।"

"তা, আজ না গেলেই হত, আর তাও বলি বৌমা, কপাল যখন পুড়েছে তখন আর ঐ ছাই ভস্ম কতগুলো পুঁথি গিলে কি হবে! তপ জপ কর্, দীক্ষে নে, তা নয়, বিদ্যেসুন্দর পড়া!"

'পিসীমা! বিদ্যেসুন্দর ছাড়া কি আর দুনিয়ায় এ যাবত কোন পুঁথি লেখা হয়নি ? আর পিসীমা! এই যে নিরু বিধবা হ'ল, এ দোষ ত তার নয়—এ দোষ তার বাবার— এ দোষ তোমাদের কৌলীন্যের! কেন এমন রোগা পটকা দেখে জেনে শুনে মেয়েটার বে দিলে, এ অকল্যাণ, এই যে

নিরুপমার দুর্দ্দশা, এর জন্য সমাজ দোষী—নির্দোষী নিরুপমা নয়।"

সে কালের প্রাচীনেরা কুলবধূর বা কুমারী ও বিধবা যুবতীদের নিন্দা করিবার মত কোন একটা সুযোগ পেলেই শতকণ্ঠে তাহা প্রচার করিতে অগ্রসর হইতেন। পিসীমা ভাবিয়াছিলেন—সুবালা তাহার নিরুপমার প্রতি কটাক্ষটুকু নীরবে হজম করিবে। সুবালা তাহা করিল না দেখিয়া তিনি মুখখানা ভার করিয়া রহিলেন। চতুরা সুবালা মুখটিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "এই ধরুন না পিসীমা, এই বয়সেও আপনার রূপের জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে, যৌবনে ত আপনি খুবই সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু কুলীনের মেয়ে কুলীন স্বামীর হাতে পড়েছিলেন বলে ত বৎসরে একদিনও হয়ত স্বামীর দর্শন পাননি।" সুবালার এই সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হইয়া পিসীমা মৃগচর্ম্মাসনে সুখাসীন হইয়া কহিলেন—"কি বল্‌বো বৌমা, তাঁর বিয়ে ছিল একশ ষোলটি। চার পাঁচ বৎসর পর একবার করে আস্‌তেন, তখন বাড়ীতে একটা আনন্দের তুফান বয়ে যেত। কত সাধাসাধি কত তোষামোদ চল্‌ত, কিন্তু কুলীন জামাই কিনা টাকার তোড়াটি হাতে না তুলে এক রাত্রিও থাক্‌তেন না।"

"যখন আস্‌তেন, তখন কি দু'চার মাস্ থাক্‌তেন না ?"

"দু' চার মাস! বলিস্ কি বৌমা' দু'তিন দিন থেকেই ছুটে পালাতেন।"

"তোমাকে ভাল বাস্‌তেন ত?"

"ভালবাসা কি তা বুঝি নি বৌ, কই টাকার কথা ছাড়া আর বাবা, দাদার নিন্দে ছাড়া একদিনও একটা মিষ্টি কথা বলেন নি। তা যদি থেকে সংসারি করতেন, তাহলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু সে যখন হয়নি, তখন তার দোষগুণের কথা আমিত বেশী কিছু জানি না বৌমা!" এই অতীত জীবনের কথা আজ আবার নূতন করিয়া স্মরণ করিয়া বৃদ্ধার দুই চক্ষু বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। মালাখানি হাতে লইয়া তিনি উঠিতে উঠিতে কহিলেন—"একটা কথা বৌমা! পুরুষ জাতটাকে বড় বেশী বিশ্বাস করিস্‌নে! ওরা আদৌ বিশ্বাসী নয়, কখন যে শিকলী কাটে তার কোন্ ঠিক্ ঠিকানা পাওয়া যায় না। সাবধান! ভূপতিকে জমিদার-বাড়ীর দিকে বড় একটা এগুতে দিস্ না।" ঠিক্ কথা—একদিন জমিদার-বাড়ীর যশোদা ঝিও কথাপ্রসঙ্গে এই কথাটিই বলিয়া গিয়াছিল 'বৌমা! দাদাবাবুকে ওদিকে আর পাঠিও না।' আজ সে কথাটি স্মরণ করিয়া ও বৃদ্ধা পিসীমার কথা চিন্তা করিয়া সুবালার মুখখানি কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল।

১২

ভূপতি চৌধুরীবাড়ীর অন্দরে আসিয়া দেখিল—নিরুপমা তাহার ঘরে নাই। ঘরে টেবিলের উপর বইগুলো ছড়ান। সে তাহার প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত টেবিলের পাশের এক-

খানা চেয়ারে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কতকগুলি পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল—তবু কাহারও দেখা নাই, এমন কি মাধুরী দেবীকেও সে দেখিতে পাইল না। তিনি প্রত্যহ এই সময়টীতে নিরুপমার পড়িবার ঘরে আসিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া পড়াশুনা শুনিতেন। ভূপতির কাছে একা একা চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিতেছিল না। আর ভিতরে ঘরের মধ্যে গরমটাও একটু তীব্র বোধ হইতেছিল।

নিরুপমার ঘরের পাশ দিয়াই বাগানে যাইবার পথ। ভূপতি মনে করিল—দীঘির ধারে একটু বেড়াইয়া আসি। বোধ হয় নিরুপমা বাড়ীর ভিতর অন্যত্র কোথাও আছে। এমনি আশ্চর্য্য যে আজ একটা ঝী পর্য্যন্ত এখানে নাই যে তাহাকে দিয়া নিরুপমাকে খবর পাঠাইয়া দেয়। ভূপতি ধীরে ধীরে বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। তখন জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ ও পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। দয়েল, পাঁপিয়া, কোকিল অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার দিতেছে। ধীরে ধীরে ভূপতি অগ্রসর হইতে লাগিল, উতলা দক্ষিণাপবন মৃদু মন্দ বহিতেছিল, ফুলের সৌরভ বাতাস বহিয়া আনিতেছিল। ভূপতি দীঘির পূর্ব্বতীরে সোপানের পাশে আসিয়া দেখিতে পাইল, নিরুপমা জীবন্ত দেবী প্রতিমার মত বকুল গাছের বাঁধান ঘাটে গাছটি হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তাহার পায়ের তলায় রাশি রাশি বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়া আছে,—তাহার

মুখের উপর বকুলের ঘন পত্রস্তবকের মধ্য দিয়া বিকীর্ণ জ্যোৎস্নার শুভ্রধবল জ্যোতিঃ অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিয়া দিয়াছে,—নিরুপমা নীরব নিশ্চলভাবে কি যেন ভাবিতেছে। তাহার কেশ এলায়িত, বসন বিস্রস্ত, কোনদিকে কোন লক্ষ্য নাই। ভূপতি ধীর স্বরে ডাকিল—"নিরুপমা!"

নিরুপমা কোন উত্তর দিল না। তাহার কাণে ভূপতির কথা পৌঁছিয়াছিল কিনা তাহাই সন্দেহ। নিরুপমার এইরূপ স্তব্ধ ভাব দেখিয়া ভূপতি একটু বিস্মিত ও ভীত হইয়াছিল, সে নিকটে আসিয়া ডাকিল—"নিরুপমা?" নিরুপমার চমক ভাঙ্গিল। হঠাৎ আহ্বান শুনিয়া নিদ্রাবিভোর ব্যক্তি যেমন অবাক্ হইয়া চমকিয়া উঠে, নিরুপমাও তেমনি চম্‌কাইয়া উঠিল—বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"তুমি—তুমি এখানে কেন এসেছ ভূপতি দাদা?"

ভূপতি কহিল—"আমি কোথাও তোমার সন্ধান পেলুম না, তোমার পড়বার ঘরে আলো জল্‌ছে, কিন্তু তোমার কোনও খোঁজ খবর নেই, যশোদাকেও দেখ্‌তে পেলুমনা যে তোমাকে একটা খবর পাঠাই, ভাব্‌লুম, তুমি হয় বাড়ীর ভেতর কোন কাজে আছ। কেমন গরম বোধ হচ্ছিল, তাই বেড়াতে বেড়াতে দীঘির ধারে এসেছিলুম। আমিও ভাবি নাই যে, তোমাকে এখানে এমন সময়ে এভাবে দেখ্‌তে পাব।"

নিরুপমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "উঃ তাই!"

ভূপতি কহিল “আজ তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন নিরুপমা ?”

“কেমন ?”

“এই কেমন যেন বিষণ্ণ ম্লান !

“অমনি, শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, উঃ আজ দুপুর বেলা যে গরম পড়েছিল।’

“নিরু ! আমাকে বলনা কি হয়েছিল, কেন তুমি আজ এত বিষণ্ণ, যেন কত কি ভাব্‌ছো ?”

নিরুপমা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—“না কিছু না ! অমনি।”

সত্য সত্যই আজ নিরুপমা একাকিনী বসিয়া অনেক কথাই ভাবিয়াছিল। সে দেখিতেছিল– পল্লী বধূরা কেমন আনন্দে শত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও স্বামীর কথা কহিয়া, ছেলেমেয়ের কথা তুলিয়া, ঘর গৃহস্থালীর কথা পাড়িয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে চলিয়া গেল। সারাদিনের শত খাটুনির মধ্যেও তাহাদের যে আনন্দ ও প্রীতিটুকু আছে, যে দুটি সোহাগের বাণী আছে, প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইয়া যে নিগূঢ় প্রেম-বন্ধনের মাঝখানে অখণ্ড শান্তি আছে, সে শান্তি সে সুখ তাহার কোথায় ? কেন, কিসের জন্য দুইদিনের জন্য তাহার জীবনের শত সুখ স্বপ্নের আশা আকাশে ঝরিয়া পড়িল। কোথায় সে এখন দাঁড়াইবে, কোথায় এখন তাহার স্থান ? সে যদি ভূপতির সহিত পরিণীতা হইত, তাহা হইলে

তাহার—না না এত সব চিন্তা করিতে সে পারে না। তাহার মন আজ বিদ্রোহ হইয়া উঠিয়াছিল।

বড় ঘরের মেয়ে জীবনে কোন দিন কোন কার্য্যে বাধা পায় নাই, আজ এই ভরা যৌবনে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রেমতৃষ্ণা সে কেন কিসের জন্য গোপনভাবে অন্তরে রাখিয়া তুষের আগুনের মত জ্বলিয়া পুড়িবে? সমাজ—পাপ—ধর্ম্ম সে তাহার কতটুকু বোঝে? সমাজ যদি বিচার করিতে জানিত তাহা হইলে কখনই এমন করিয়া তাহায় বলি দিত না। যে সমাজ তাহাকে জীবনের শান্তি, সুখের হাত হইতে চিরদিনের জন্য দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, সে সেই সমাজকে কোনমতেই মানিয়া চলিবে না। পাপ—হউক সে অন্যায়? ধর্ম্ম—যাক্ সে রসাতলে, কিছু সে চায় না, যে শুধু চায় জীবনের আনন্দ—যৌবনের প্রীতি প্রেম ভালবাসা। কুৎসিতা সুবালা যদি সংসারে সুখী হইতে পারে, তবে তাহার ন্যায় সুন্দরী যুবতী কেন দুঃখ বেদনার পশরা বহিয়া অরুন্তুদ মর্ম্ম যাতনা সহ্য করিবে? এ চিন্তা তোমরা একজন বিধবা যুবতীর পক্ষে দোষের বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু যে কথা সত্যসত্যই নিরুপমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল—আমরা ঠিক্ সেই কথাই বলিলাম।

ভূপতির মনে আজ ঢেউ উঠিয়াছিল, এ ঢেউ নূতন নহে, যেদিন অনিল তাহার সহিত নিরুপমার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই তাহার মনে নিরুপমার

প্রতি আসক্তির বীজ সুপ্ত ভাবে নিহিত ছিল। এক কথায় সে নিরুপমাকে ভালবাসিত—সে ভালবাসা কৃত্রিম নহে, শুধু লালসার নহে—সে ভালবাসা সত্য সত্যই গভীর ছিল,—কত দিন সে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছে যে সুবালাকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া তাহার মন মধ্যে নিরুপমার হাসি-ভরা মুখখানি আসিয়া জাগিয়াছে। সে সংযম দ্বারা—জ্ঞানের দ্বারা ইহা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। নিরুপমার স্বামী যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় এতদিনে সে সব ভুলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও হইল না! যে স্মৃতি সে ভুলিতে পারিত, এখন কিনা সেই রূপের আগুন তাহারি চারিপাশে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রূপ-লালসা-বিভোর পতঙ্গ কোথায় পালাইবে? এ আগুণের হাত এড়াইয়া সে কোথায় যাইবে? দুইদিকে যখন এমনি ভাবে একটা তরঙ্গের চঞ্চল নৃত্য চলিতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে আজ এই নিভৃত নিকেতনে দুইজনের দেখা হইল।

ভূপতি নিরুপমার পাশে আসিয়া কহিল, "অম্‌নি নয়, নিরুপমা? বল কি হয়েছে, কেউ কি তোমায় কোন মন্দ কথা বলেছে?"

নিরুপমা হাসিয়া কহিল—"কে বল্‌বে? যা কিছু ভাল মন্দ, দু'চার কথা তা শুধু তুমিই বল—একদিন ভাল করে পড়া না বল্‌তে পার্‌লে, তুমি কত কথা শুনিয়ে দাও?"

ভূপতি অলক্ষে নিরুপমার হাতখানা ধরিয়া অতি কোমল

কণ্ঠে—যে সুর শুধু ভাববিহ্বল প্রণয়ীর কণ্ঠেই শোভা পায়, সেই সুরে কহিল—"তাতে কি তুমি রাগ কর নিরুপমা?"

নিরুপমা ভূপতির একটু নিকটে ঘেঁসিয়া কহিল—"হই বৈকি ভূপতি দাদা?"

ভূপতি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"তা হলে আর আমি তোমাকে পড়াতে আস্‌ব না নিরু?"

"বল্‌লেই কি পারবে? কে তোমায় ছেড়ে দেবে? তোমাকে আস্‌তেই হবে!"

ভূপতি হাসিয়া কহিল—"কেন?"

"কেন? তুমি যে আমায় ভালবাস ভূপতি দাদা। ছেলে-বেলা থেকে তোমার উপর কত অত্যাচার উপদ্রব করে আস্‌ছি, কত বায়না করেছি, কই একদিনের জন্যও ত তুমি রাগ করনি, আর আজ তুমি একটী কথায় আমার উপর রাগ করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। যে ভালবাস্‌তে জানে, সে কি কখন রাগ করতে পারে?"

নিরুপমার মুখে আজ এক সঙ্গে এতগুলি কথা শুনিয়া ভূপতির প্রাণ, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার এই কথা মনে করিয়া অনন্দ হইল যে, নিরুপমা তাহার ভালবাসা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ভূপতি এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। এই মধুর জ্যোছনা, এই এত সুন্দর ফুলের হাসি, এই বকুলের উগ্রমদির গন্ধ, আর পাশে এই সুন্দরী যুবতী। আর এমনি সময়ে বকুলকুঞ্জের নীড় হইতে অযাচিত ভাবে

দুইটী কোকিল কুহু কুহু রবে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ভূপতির কেমন ভুল হইয়া গেল। সে সব বিস্মৃত হইল, নিরুপমাকে আবেগভরে বাহুবন্ধনে বন্ধন করিয়া কহিল, "নিরুপমা, আমি ত তোমায় ভালবাসি, কিন্তু তুমিও কি আমায় ভালবাস ?" এমন আদর—এমন স্নেহ এমন ভাবে পুরুষের দৃঢ় বাহুযুগলের মধ্যে নিরুপমা কোন দিন বাধা পড়ে নাই, সে মদবিহ্বলা নারীর ন্যায় অলসভাবে শরীর এলাইয়া দিয়াছিল, ভূপতির কথায় যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত কহিল—"আমি তোমায় খুব ভালবাসি ভূপতি দাদা !" ভূপতি নিরুপমার মুখের আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, ঘন ঘন চুম্বন দ্বারা নিরুপমার গণ্ডদ্বয়, মুখ ও মস্তক আচ্ছন্ন করিয়া দিল। নিরুপমা জ্ঞানহীনা স্পন্দনরহিতা মূর্চ্ছিতা রমণীর ন্যায় ভূপতির বাহুপাশে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল।

১৩

সাধুজী একদিন শিষ্য চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন—"বৎস! তীর্থ-ভ্রমণের ন্যায় আর মহৎ পুণ্যকর্ম্ম কিছুতেই নাই। এস বৎস, এই উত্তম সময়, আমরা ঋষি নিষেবিত পুণ্য বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ করে আসি—সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করে নয়নযুগল চরিতার্থ করি এবং পৃথিবীর সমুদয় বন্ধন হতে মুক্ত হই। শ্রীশিব শঙ্কর ! জয় বদ্রিবিশাল !"

চৌধুরী মহাশয়ও অনেক দিন হইতেই ভ্রমণের জন্য উৎসুক

ছিলেন। চিরদিন একই স্থানে একই ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে তাঁহারও প্রাণে ভ্রমণের স্পৃহা জাগরিত হইয়াছিল। তিনি গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। বড়লোকের কাঁধে কোন খেয়াল চাপিলে তাহা পূর্ণ হইতে বড় বেশী বিলম্ব সয় না, চারিদিকে একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়। এই বাঁধ—এই টেলীগ্রাফ কর, এই ঠাকুর খান্‌সামার ব্যবস্থা কর,—বাড়ী ভাড়া কর, তোড়জোড় কর। চৌধুরী মহাশয় গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষটায় বদরীনারায়ণের পথে অগ্রসর হইবেন। চৌধুরী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখা প্রয়োজন, কাজেই অনিলকে টেলীগ্রাফ করিয়া জানান হইল যে, সে যেন শতকার্য্য উপেক্ষা করিয়াও বাড়ী চলিয়া আসে।

অনিল কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস্‌ জমাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা "সমাজ সংস্কারসাধিনী" সভার অধিবেশন লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় তাহার অনেক কাজ জুটিয়াছিল—সে আর্য্যসমাজের একজন প্রধান সভ্য, আর্য্যসমাজের অধীনস্থ 'সমাজ-সংস্কারসাধিনী' সভার মহৎ উদ্দেশ্য যেমন 'জাতি-বর্ণাশ্রম ভঞ্জন, বিধবা-বিবাহ, নিম্নশ্রেণীকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া জলাচরণীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা, এ সকলই ছিল তাহার প্রধান লক্ষ্য। অনিল মনে প্রাণে এ সকল কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল—"সে রাজনীতি অপেক্ষাও সমাজনীতি যে আমা-

দের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিবার প্রধানতম সোপান তাহাই তাহার মনে দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়াছিল। পিতার টেলীগ্রাম পাইয়া সে সংবাদ কলিকাতার প্রধান আচার্য্য শ্রীবল্লভানন্দ মহাভারতীকে দেখাইলে তিনি বলিলেন—"বৎস! পিতৃ-আজ্ঞা পালন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তুমি দেশে যাও, পল্লীসমাজ আমাদের সামাজিক হিতানুষ্ঠানের প্রশস্ত ক্ষেত্র।" অনিল সেদিনই দেশে যাত্রা করিল। দেশে পঁহুছিয়া পিতার গুরুদেবকে দেখিয়া সে কোন কথাই বলিল না। সম্প্রতি আর্য্যসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহার সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল।

অনিল পিতাকে কহিল—"বাবা! আপনার সঙ্গে কে কে যাচ্ছেন?"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"গুরুদেব এবং দু'চারিজন কর্ম্মচারী, ঠাকুর, চাকর এই, আর বেশী লোক নেওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না।"

"সে হয় না বাবা! আপনি গুরুদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে পারেন সত্য, কিন্তু অত দূর দেশে—বিশেষ নানা বিভিন্ন স্থানে একজন উপযুক্ত লোক সঙ্গী করা একান্ত শ্রেয়ঃ।"

'কে আছে বল, কাকেই বা সঙ্গে নেই?'

'কেন ভূপতিকে সঙ্গে নিলে হয় না? শুনলুম মা ও নিরুকেও সঙ্গে নিচ্ছেন,—'

'সেত আমি ভাবিনি।'

'সে কেমন ?'

'গুরুদেবকেত সে কথা জিজ্ঞেস করিনি ?'

'বাবা, সব তাতেইত আর গুরুদেবের দোহাই দিলে চলে না !'

'তিনি যে গুরুদেব—'

'হাঁ বাবা, তিনি গুরুদেব ! কিন্তু অন্যান্য সাধু-পুরুষদের যেমন একটা পরিচয় জানা থাকে, এঁর তেমন কিছুই নেই, তারপর আমরা কোনমতেই আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। মাকে ও নিরুকে সঙ্গে নিয়ে যান। নিরুপমা এই অশান্তির মধ্যেও নানা তীর্থ পর্য্যটন কল্লে অনেকটা শান্তি পাবে। আমি আপনার উপদেশ মত এদিকের সব কাজকর্ম্ম দেখ্‌বো।'

গুরুদেব অনিলের এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেও সে আপত্তি টিকিল না। অনিলও বাড়ীর ভিতর যাইয়া বিমাতাকে পিতার সঙ্গী হইবার জন্য বিশেষরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল। ফলে—একদিন শুভদিন দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় সপরিবারে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন,—মাধুরীদেবী, নিরুপমা ও ভূপতি তাঁহার একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও সঙ্গী হইয়াছিল।

১৪

সুবালা স্বামীকে এমন ভাবে ছাড়িয়া দিতে আদৌ রাজি ছিল না। পিসিমাও নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনিল যখন সমুদয় অবস্থাটা বুঝাইয়া দিয়া কহিল যে

ভূপতিকে না পাঠাইলে কোনমতেই চলিতে পারে না, তখন আর তাঁহার আপত্তি করিবার কোন হেতু রহিল না। ভূপতি পিসীমার পদবন্দনা করিয়া, স্ত্রীকে গৃহস্থালী সম্পর্কে উপযুক্ত আদেশ ও উপদেশ দিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল। সুবালা স্বামীর এই প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে যেন কেমন হইয়া গেল। সে কয়েকদিন হইতেই স্বামীর চরিত্রে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল—কি যেন ভাবনায়, কি যেন একটা গভীর চিন্তায় তাহার প্রাণ বিষণ্ণ অথচ কোন দিনই জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কোনও উত্তর পায় নাই, কেন এমন হইল? তবে কি সে অজ্ঞাতে এমন কোন অপরাধ করিয়াছে যে, সেই দোষের জন্য স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? সে ভাবিয়া কোন হেতুই পাইল না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সুবালা স্বামীর নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল। ভূপতি এলাহাবাদ হইতে পত্র লিখিয়াছে।

প্রিয়তমে!

আমরা নিরাপদে এখানে এসেছি। গয়া ও কাশী তীর্থ পর্য্যটন আমাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দর এ প্রয়াগ তীর্থ, আমার একা এ দেশের নানা শোভা দেখিয়াও তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, যদি তুমি সঙ্গী হইতে তাহা হইলে কতই না আনন্দ হইত! যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিব। কি করিব বল, সংসারে অনেক কাজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করিতে হয়, এই পরিবারের নিকট আমরা নানাভাবে

ঋণী, কাজেই এইবার যদি অনিলের কথা না রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে কত বড় অন্যায় হইত তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার। খোকাবাবু কেমন আছেন? পিসিমাকে আমার প্রণাম জানাইও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও। কাশীর ঠিকানায় পত্রের উত্তর দিও—আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সে ঠিকানায় চিঠি লিখিলেই পাইব (ইতি)

তোমার—ভূপতি।

স্বামীর এই চিঠি পাইয়া সুবালার প্রাণ হইতে যেন একটা আশঙ্কার কালোমেঘ দূরে সরিয়া গেল। হিন্দুনারী এমন করিয়াই স্বামীর সমুদয় অপরাধ ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লয়, দুইটী মধুর বাণীতে সব ভুলিয়া যায়।

৫

প্রয়াগের গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম স্থল, ভারতের দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে অতি বড় মনোরম। একদিকে গঙ্গার ধবল জলরাশি, অপর দিকে যমুনার নীলজল আসিয়া মিশিয়াছে। এই পুণ্যসঙ্গম স্থলে প্রয়াগের দুর্গ অবস্থিত। দুর্গের পাশ দিয়া যে পথ গিয়াছে, তাহারি পাশে একটী সুন্দর ছোট বাড়ীতে শশীবাবু বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুদেব বাঙ্গালার সীমা ছাড়িয়াই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, প্রত্যহই শিষ্যের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া কোন না কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সেদিন—ভূপতি নিরুপমা ও মাধুরীদেবীকে সঙ্গে করিয়া সহর বেড়াইতে বাহির

হইয়াছে, চৌধুরী মহাশয় বাসায় বসিয়া গুরুজীর সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে বাহিরে একজন লোক গুরুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। গুরুজী একটু চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মুখের সেই চঞ্চল ভাবটা পরিবর্ত্তিত করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন—"আচ্ছা উন্‌কো বোলায় লে আও।" খানিক পরে ভৃত্যের সহিত একজন দীর্ঘকায় পুরুষ প্রবেশ করিল। এই নবাগত পুরুষটির রং মিশ্‌মিশে কালো, মাথায় দীর্ঘজটা, বলিষ্ঠ দেহ, চক্ষু দুইটী বৃহৎ ও গোলাকার, ওষ্ঠ-দ্বয় পুরু, নাসিকা চেপ্টা এই নবাগত ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াই গুরুজীকে প্রণাম করিল এবং চৌধুরী মহাশয়কে নমস্কার করিয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিল। গুরুজী চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন—"শশী, এ আমার বড় ভক্ত, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে এর আশ্রম আছে। ওর অনেকদিন থেকে ইচ্ছা, একবার আমরা ওখানে বেড়িয়ে আসি। তা বাবা, তোমার আমার ত ফুরসৎ নেই, আজ বৌমা ও খুকী বাড়ী নেই, চল আমরাও এই অবসরে একটু বেড়িয়ে আসি।" এই সাধুজী চৌধুরী মহাশয়ের উপর এমনি অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে তাহার কোন কথার উপর তিনি আদৌ প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। তখন সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী, কোথায় যাইতে হইবে তাহাও জানা নাই, বিশেষ এইরূপ অপরিচিত স্থানে যাওয়া সঙ্গত কিনা সে কথাও তিনি

একবার চিন্তা করিলেন না। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া কহিলেন "আজ্ঞে, চলুন।" তাঁহাকে এইরূপ ভাবে গমনোদ্যত দেখিয়া পাঞ্জাবী পালোয়ান গুরুসিং কহিল "হুজুর, আমি আপনার সঙ্গে আস্‌বো কি?" গুরুজী কহিলেন "আরে কুচ্ জরুরত নেহি হ্যায়।" চৌধুরী মহাশয়ও গুরুসিংকে কহিলেন "তুমি বাবা বাড়ীতেই থাক; ওঁরাও যে এখনও ফিরছেন না?" শশীবাবু, গুরুজী ও তাহার নবাগত চেলা বাহির হইয়া গেলেন। গুরুসিংএর কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগিতেছিল না। সে ফটকের বাহির হইয়া দেখিল একখানা টম্‌টমে চড়িয়া তাঁহারা তিনজনে উত্তর দিকে চলিয়াছেন। গুরুসিং ত্রস্ত বাঙ্গালী ভৃত্য মথুরসিংকে কহিল 'ভাই, তুই কোথাও যাস্‌নে, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।' মথুর রাজি হইলে গুরুসিং তাহার ছোরা খানা কোমরে গুঁজিয়া এবং দীর্ঘ যষ্টিখানা হাতে লইয়া সেই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল।

পশ্চিমদেশীয় যে কোন সাধুবেশ-ধারী ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করিলেই আজকাল বাঙ্গালীদের তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া শিষ্য হইবার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যায়। এই শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভণ্ডের সংখ্যাই বেশী। ইহারা নানারূপ ঔষধ-কবচ এবং তুক্-তাক্ দ্বারা সাধারণ লোকের চিত্তজয় করিয়া শেষটায় নানা বীভৎস কাণ্ড করিয়া বসে। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, তবু এই শ্রেণীর লোকদের উপর বাঙ্গালা জনসাধারণের—এমন

কি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও কোনরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার হ্রাস পায় নাই। মহাপুরুষ যে নাই এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহারা কখনও এমন ভাবে দেশে দেশে ঘুরিয়া—এমন কি বাঙ্গালার সুদূর গ্রাম্যপ্রান্তে পর্য্যন্ত যাইয়া আত্মশক্তি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন না। আমরা প্রতারিত হইয়াও এমনি ভ্রান্ত যে, যে কোন ব্যক্তির মাথায় জটাভার দেখিতে পাইলেই তাহার পশ্চাতে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া যাই। এই গুরুজীও একজন ভণ্ড সাধু। নানা দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া নানাভাবে প্রলোভিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই দলে বহু ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসী আছে, যাহারা গুরুর আদেশ অনুযায়ী নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করে। সংবাদপত্রে এইরূপ বহু সন্ন্যাসীর কথা কতবার যে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

গুরুজী শিষ্যদের ন্যায় সাধারণ গৃহস্থের কাছে বড় একটা ঘেঁসিতেন না, তিনি রাজা মহারাজাদের দরবারেই অধিকাংশ স্থলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতেন। কোনও বড় লোকের বাড়ীতে যাইয়া হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলাটা তেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কাজেই এতদিন তিনি নীরবে নানাভাবে চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, শেষটায় যখন দেখিলেন যে, এ মাছ শিকার করিতে তেমন বেশী আয়াসের কাজ নয়, তখন ধীরে ধীরে কৌশলক্রমে

খেলাইতে আরম্ভ করিলেন। এই তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যও গুরুজীর কোনও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে সে কথা না বলিলেও চলে।

টম্‌টম্‌খানা ক্রমশঃ সহরের পথ ছাড়িয়া একটা খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শশীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এতটা দূর জান্‌লে, কাল সকালেই বরং আস্‌তুম বাবা!" গুরুজী বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন—"কেন বাবা, দূরত্ত তেমন বেশী নয়।" "আজ্ঞে, ফির্‌তে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে।" এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই তাহারা একটি বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর চারিদিকে আম ও তালের সারি। চারিদিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। গুরুজীর হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীটি—"লছমিয়া" বলিয়া চীৎকার করিতেই একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক একটা মাটির প্রদীপ হাতে লইয়া ভাঙ্গা ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গুরুজী ও শিষ্যটী শশীবাবুকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে ফটকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলেন। শশীবাবু দেখিলেন যে একটী ভগ্ন জীর্ণ একতালা দালান, সম্মুখে একটী হাড়িকাঠ প্রোথিত। গুরুজীর ইঙ্গিতে শশীবাবু দালানের একটী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, একজন লোক আসিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দিল। শশীবাবু শিহরিয়া উঠিলেন—একি ভীষণ দৃশ্য! ঘরের মাঝখানে একটী মলিন ফরাস পাতা, তাহার মাঝখানে

বোতল ও গ্লাস, আর প্রায় আটজন ভীষণাকৃতি ব্যক্তি সেখানে বসিয়া আছে। শশীবাবু আসিবামাত্রই সকলে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি এখানে এসেছেন।" গুরুজী মধ্যস্থলে পদ্মাসন করিয়া বসিলেন। তারপর তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "দেখ চৌধুরী, তোমাকে এক কাজ করতে হবে, সেজন্যই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি।" চৌধুরী মহাশয়ের সারাদেহ ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপিতেছিল, তিনি জড়িতকণ্ঠে কহিলেন "কেন বাবা ?" গুরুজী একখানা কাগজ ও দোয়াত কলম দিয়া কহিলেন, "তুমি এই কাগজে তোমার ছেলের কাছে লিখে দাও যে, পত্রবাহক শ্যামানন্দ স্বামীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যে করে পার সংগ্রহ করে দিবে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভূপতি বাবু পীড়িত সেজন্য তাকে পাঠাতে পারলে না।" শশীবাবু ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"আপনি টাকার জন্য এভাবে আমাকে লিখতে বলছেন কেন? আপনার কথায় প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ত আমি বহু অর্থব্যয় করেছি।" গুরুদেব গর্জ্জিয়া কহিলেন "আমি সে সব কথা শুনতে চাই না, তুমি লিখে দাও।" শশীবাবু কহিলেন "এমন অন্যায় আবদার আমি রাখতে পারবো না।"

ভীম ভৈরবরবে গুরুজী গর্জ্জিয়া কহিলেন "পারবে না কি, পারতে হবে।" "না আমি পারবো না, আমি কোন

দিন ভুলেও মনে করিনি যে আপনি একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী, আপনাকে বিশ্বাস করে শেষটায় কি আমার এই ফল হল ?”

“তর্কের প্রয়োজন নাই—লেখ।”

“যদি না লিখি ?” আজ কোথা হইতে যেন তেজস্বী চৌধুরী মহাশয়ের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনিও তারস্বরে কহিলেন “যদি না লিখি ?” “যদি না লিখ, তবে এই দেখ”—গুরুজীর ইঙ্গিত মাত্রে একসঙ্গে আটজন লোক আটটী সুতীক্ষ্ণ ছোরা উন্মুক্ত করিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। “যদি না লিখ, তাহলে এক্ষুণি তোমাকে হত্যা করবো। কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।” চৌধুরী মহাশয় বিপদটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া স্বরটা একটু নামাইয়া কহিলেন, “বেশ আমি বরং লিখে দিলুম, কিন্তু আমার ছেলে যদি টাকা না দেয়, এবং সন্দেহ করে, আপনার প্রেরিত চেলাকে পুলিশের হাতে দেয়, তখন কি করবেন ?” একসঙ্গে সকলের মুখ হইতে একটা বিকট হাস্য ফুটিয়া উঠিল তাহারা কহিল “পুলিশ, অনেক শালা পুলিশের মাথা এখানে আছে, তুমি লেখ, নতুবা—”

এমন সময় সজোরে বাহির হইতে কে যেন দরোজায় একটা আঘাত দিল, মট্ করিয়া দরোজাটা ভাঙ্গিয়া গেল। গুরুসিং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নিমেষমধ্যে শশী বাবুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বেগে বাহির হইয়া আসিল।

গুরুজী ও তাহার শিষ্য সেবকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়া দেখিল বহু দূরে অতি দ্রুত একখানা মোটর চলিয়া যাইতেছে।

এলাহাবাদ বড় সহর হইলেও অতি ভীষণ স্থান, সদা সর্ব্বদাই দস্যুতস্করের প্রাদুর্ভাব। অন্য কেহ এই ছয়মাস যাবত গুরুজীকে দেখিয়া কোনও রূপ সন্দেহের চক্ষে না দেখিলেও গুরুসিং গুরুজীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না, তাহার এই সাধুর প্রতি সর্ব্বদাই একটা সন্দেহ জাগিয়াছিল। সেজন্য গোপনে সতর্কভাবে সকল সময়েই গুরুজীর চাল-চলন এবং কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিত। আজ এই ভাবে একাকী চৌধুরী মহাশয়কে ঐরূপ একজন ভীষণাকার ব্যক্তির সহিত বাহির হইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইয়াছিল। দ্রুতগামী টম্‌টমের পেছনে মানুষ আর কতক্ষণ ছুটিতে পারে, তাই সে একখানা টেক্সি ভাড়া করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়া এইভাবে বিপন্ন প্রভুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পরদিন পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পুলিশের বড় সাহেব বলিলেন যে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। ইহাদের ধরা বড় সহজ নহে, ইহারা নানস্থানে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে। গুরুসিং বহু পুলিশ লইয়া সেই বাড়ীর সন্ধান পাইল বটে, কিন্তু কোন জন-মানবের সাড়া পাওয়া গেল না। পুলিশ ঐ বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া

একটী ঘরে একজন মাড়োয়ারীর মৃতদেহ পাইয়াছিল—আঙ্গিনার এখানে সেখানে যে কত নর-কঙ্কাল ছড়ান রহিয়াছে তাহার অবধি নাই; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রয়াগের মাত্র পাঁচ সাত মাইল দূরেও এমন একদল গুণ্ডা যে কি ভাবে নিরাপদে তাহাদের দস্যুবৃত্তি পরিচালনা করিতেছিল তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। ইংরাজরাজের কঠোর শাসনের মধ্যেও প্রতিনিয়ত এমনি যে কত ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে তাহার অবধি নাই।

১৬

হঠাৎ এইরূপ একটা অস্বাভাবিক গুরুতর আঘাতে চৌধুরী মহাশয় প্রাণে বড়ই দুঃখ পাইয়াছিলেন। মানুষ যে এত বড় অকৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মের নাম দিয়া অর্থের জন্য নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, পল্লীগ্রামবাসী জমিদারের পক্ষে বাস্তবিকই এই ঘটনা একটু বিচিত্র রকমেরই মনে হইতেছিল। এই সাধুর বাক্যে তিনি কতদিন কত নিরীহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজাকে তাড়াইয়া দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, যে যজ্ঞে শুধু ঘৃত, মদ, মাংস এবং বিবিধ উপাচারে সজ্জিত নৈবেদ্য ব্যয়িত হইয়াছে। কাহার জন্য তিনি এ সব করিয়াছেন, কল্য রাত্রির সেই ভীষণ উত্তেজনায় তাঁহার শরীর তখনও কাঁপিতেছিল, আজ প্রথম বহুকাল পরে একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল—ঈশ্বর কোথায়? শুধু কি অনুষ্ঠানে—না মনে—ধ্যানে।

মাধুরী, নিরুপমা ও ভূপতি বাড়ী ফিরিয়া চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভূপতি লোকজন সঙ্গে করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সহরের দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না, রাত্রি প্রায় একটার সময় ভূপতি বাড়ী ফিরিয়া সমুদয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন যে, আর কোন মতেই এলাহাবাদে থাকা তাহাদের সঙ্গত হইবে না। মাধুরী দেবী এবং নিরুপমাও তাহার কথার সমর্থন করিলেন। চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া মাধুরী দেবী কহিলেন "দেখ, আমরা মূর্খ স্ত্রীলোক, ধর্ম্মের কোন ধার ধারিনে, কিন্তু একটা কথা কি তোমার একবারও ভাবা উচিত ছিল না যে, একটা অজ্ঞাত লোকের কথায় কেন মিছি মিছি এত টাকা পয়সা ব্যয় করি? আমাদের পর্য্যন্ত তুমি সঙ্গে আনতে চাওনি, তুমি এত বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ জমিদার হয়ে শেষটায় এমন করে ঠকে গেলে?

চৌধুরী মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন, সত্য সত্যই তিনি লজ্জা ও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। ভূপতি কহিল "ওসব কথার আলোচনা করার এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি, দু'দিন এখানে থেকে একটু বিশ্রাম করে কিছুদিন কাশীবাস করে চলুন বাড়ী ফেরা যাবে।"

নিরুপমা কহিল "হ্যাঁ, বাবা, সে বেশ হবে।" এই ভ্রমণের সঙ্গীরূপে ভূপতির সহিত নিরুপমার প্রণয় আরও গভীরতর

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূপতির কোন কথারই সে প্রতিবাদ করিত না, মনে করিত, তাহার চেয়ে যুক্তিযুক্ত কোন কথা আর নাই।

চৌধুরী মহাশয় নীরবে সম্মতি জানাইলেন।

মাধুরী, নিরুপমার সহিত ভূপতির যে একটা অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, অনেক দিন। যেদিন চৌধুরী মহাশয় তীর্থ যাত্রা স্থির করিয়া আসিয়া মাধুরী দেবীকে সংবাদটা দিয়াছিলেন, সেই দিন পিঞ্জর-বদ্ধা বিহঙ্গিনী মুক্তির সন্ধান পাইলে যেমন দু'খানি পক্ষ ঝাপটিয়া উড়িতে চাহে, তাহার সারা দেহে মুক্তির ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, মাধুরী দেবীও এই সংবাদে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া নিরুপমাকে সেই শুভ সংবাদটা দেওয়ার জন্য তাহার সন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু কোথাও খোঁজ না পাইয়া দীঘির ধারে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন কে যেন বকুল তলায় বসিয়া আছে, তাই আনন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিয়াছিলেন—"নিরুপমা!" কিন্তু নিকটে আসিয়া যখন নিরুপমাকে ভূপতির কণ্ঠলগ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি দ্রুত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। একথা তিনি কোনদিন নিরুপমাকে কোন প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেন নাই। মাধুরী দেবী এই দুইজনের গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন উভয়ের মধ্যে এখন আর লজ্জার বাঁধন নাই বলিলেই চলে, নিরুপমা, প্রতি মুহূর্ত্তেই কোন না কোন কাজে ভূপতি দাদার সঙ্গ পাইতে ভালবাসে।

ভূপতিও চায়ের পেয়ালাটি যদি নিরুপমার হাত দিয়া না আসে তাহা হইলে তাহার মুখের একটা অপ্রসন্নভাব আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। এই ভাবে অতি সামান্য সামান্য ঘটনায় ভূপতি ও নিরুপমার গুপ্ত প্রণয়ের কোন ইতিহাসই মাধুরী দেবীর অজ্ঞাত ছিল না। এ বিষয় লইয়া এই বুদ্ধিমতী নারী অনেক দিন অনেক কথা চিন্তা করিয়াছেন। কি করিবেন? কথাটা চৌধুরী মহাশয়কে জানাইয়া কি এখন হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, না কথাটা গোপন করাই ভাল। আবার ভাবিলেন নিজেই বুঝিতেছি বৃদ্ধ ব্যক্তির তরুণী যুবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা কত বড় অন্যায়। শুধু কি টাকা পয়সা, অলঙ্কারেই নারীর তৃপ্তি হয়, আর কি কিছুই না! এই রক্তমাংসের শরীর—নির্জীব. নিশ্চল নহি, এই দেহ কি এমনই অসাড় যে, কোন দিন সামান্য কামনারও উন্মেষ হয় না। সে ভাবিল এই যে বাঙ্গালা দেশে যুবতীগণ কেরোসিন তেলের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, বিষ খাইয়া দেহত্যাগ করে, নিশ্চয়ই তাহার মাঝে অনেক নিরাশার তপ্ত জ্বালা আছে। মাধুরী দেবীর বয়স সতের আঠার বৎসরের বেশী না হইলেও এই সব নানা কথা ভাবিয়া দেখিবার মত জ্ঞান তাহার ছিল।

তাহার আর এক কথা মনে পড়িল, একদিন অনিল বলিয়াছিল, নিরুপমা ভালভাবে লেখাপড়া শিখুক, তারপর তার বিবাহ দেওয়া হবে। নিরুপমার স্বামীও এই কথাই মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গিয়াছিল। গুপ্ত পাপ অপেক্ষা, গোপনে ভ্রূণ হত্যা

করিয়া সমাজে সতীনামে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা এইরূপ বিবাহ যে শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর এই ভূপতির সঙ্গেই ত এক সময়ে নিরুর বিবাহের কথা উঠিয়াছিল। কুলীনের দুই বিবাহেত কোন দোষ নাই, না—না—আমি কোন বাধা দোব না, শুধু একবার নিরুপমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব—সত্য সত্যই সে ভূপতিকে ভালবাসে—না সে একটা রূপের মোহ মাত্র, তারপর যে ভাবেই হউক ব্যবস্থা করিবই করিব। আমি জ্বলিব কিংবা জ্বলিতেছি বলিয়া কোন মতেই নিরুপমাকে যন্ত্রণা পাইতে দিব না।

ভূপতি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। শীতকালের বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিরুপমা মাধুরী দেবীর বসিবার ঘরে আসিয়া কহিল—"দেখ নূতন মা, আমি ভূপতি দাদাকে বারণ কল্লুম যে তুমি শেষ বেলাটায় বেরিও না, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুন্‌লেন না। কাল যে ভয়ানক ঘটনা ঘটেছিল, এরপর আমাদের উপর নিশ্চয়ই ও বেটাদের নজর আছে, আজ এমন কি ঠেকা কাজ ছিল যে না বেরুলেই হত না।"

নিরুপমার এই ব্যাকুলতায় মাধুরী দেবী একটু হাসিয়া কহিলেন—"ভয় নাই নিরু, ভূপতি ত জমিদার নয়, আর তন্ত্র সিদ্ধ হবার জন্য ব্যাকুল নয় যে সাধু সন্ন্যাসীর পেছুন নিতে যাবে।"

"ওঁর আবার কতকগুলি গোয়ার্তুমি আছে—যে কাজ কর্ত্তে তুমি যতই মানা করবে, ঠিক্ সেই কাজটিই তিনি তত বেশী আগ্রহের সহিত করবেন।"

"পুরুষ মানুষত এমনই হওয়া চাই, পুরুষ হবে পুরুষের মত সাহসী, নির্ভয় বীর, সত্যবাদী ও পুরুষত্ব বর্ণবিশিষ্ট, এইজন্যই ভূপতিকে আমার খুব ভাল লাগে। ভূপতি যদি আমাদের সঙ্গে না আসৃত তাহলে কতই না বেগ পেতে হত। সত্য সত্যই ভূপতি মানুষের মত মানুষ।" মানুষের স্বভাবই এই যে সে যাহাকে ভালবাসে তাহার কোনও প্রশংসার কথা শুনিলে, আপনা হইতেই তাহার প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, মুখে চোখে একটা প্রফুল্লতার দীপ্তি বিকসিত হয়। মাধুরী দেবী এই কৌশল করিয়া নিরুপমার মনের ভাব সুস্পষ্ট ভাবে জ্ঞাত হইবার নিপুণতায় নিরুপমা ধরা পড়িয়া গেল। সে হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, নূতন মা, ভূপতি দাদা একটা মানুষের মত মানুষ।"

এইবার সুযোগ পাইয়া মাধুরী দেবী নিরুপমাকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"নিরু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্য কথা বলবেত ?" নিরুপমা বিস্মিত হইয়া কহিল—"এমন কি কথা মা ?"

"কথাটা তেমন কিছু নয়, তুই কি ভূপতিকে ভালবাসিস্ ? বলনা, কোন লজ্জা নেই, ভালবাসায় কোন পাপ নেই।"

নিরুপমার সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল, তাহার কাণের ডগা হইতে সারা মুখখানি অস্বাভাবিক লাল হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। যে নিরুপমা অজস্র বকিয়া যাইতে পারিত, আজ কি না সে নীরব। মাধুরী দেবী

পুনরায় নিরুপমার চিবুক স্পর্শ করিয়া অতি কোমলকণ্ঠে কহিলেন—"নিরু, বলনা, কোন লজ্জা সঙ্কোচ নেই, তুমি যে ভাবে বিধবা হয়েছ, এই বিবাহ—বিবাহই নয়। তুমি বলনা, কোন শঙ্কা ক'র না।" নিরুপমা ধীরস্বরে মাথা নীচু করিয়া কহিল—"হ্যাঁ মা, আমি ভালবাসি।"

"ভূপতিও কি তোকে ভালবাসে?"

নিরুপমা মৃদুভাবে কহিল—"তিনি আমায় ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসেন।"

"আচ্ছা নিরু, আজ যদি ভূপতির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে আমরা রাজি হই, ভূপতি কি তোমাকে বিবাহ করবে, সে সাহস কি তাঁর আছে?"

"না—না—বিবাহ কেন?"

"বিবাহ কেন? অবশ্য বিবাহ চাই, এ কখনো হতে পারে না যে, তুমি সমাজ-পরিত্যক্তা ব্যভিচারিণী হও—সে কখনো হতে পারবে না।"

'তা—আজ এ কথা কেন নূতন মা?'

'নূতন নয়'—তারপর মাধুরীদেবী আনুপূর্ব্বিক সমুদয় কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—"আমি অনেক ভেবেছি নিরু! তোমার এমন শিক্ষা হয় নাই, এমন আদর্শ তুমি জীবনে পাওনি যে সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যকে আশ্রয় করে জীবন অতিবাহিত করবে। যেখানে বৃদ্ধ পিতাও বিলাসী মদ্যপ্রিয়,—আমি তোমার বাবার নিন্দা কচ্ছি না, সেই গৃহে—সেই

সমাজের মধ্যে লালিত পালিত হয়ে তুমি কখনো জীবনকে নির্ম্মলভাবে বহন করে নিতে পারবে না।"

'নূতন মা—'

"হ্যাঁ, আর একটা কথা এই যে ভূপতি বিবাহিত, কিন্তু কুলীনের অমন দু'বিবাহ হয়, অনেকেত অমনিও দু'বিবাহ করেন, যেখানে ভালবাসা প্রবল, সেখানে কোনদিকেই কোন দুঃখ থাকতে পারে না, প্রেম সর্ব্বজয়ী।'

'নিরুপমা, কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার মনে অনেক কথাই জাগিতেছিল। কই সে ত কোনমতেই তাহার মৃত স্বামীর স্মৃতিটুকু মানসচক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না, কিন্তু একজনকে সে দেখিতে পাইতেছিল—চির উজ্জ্বল—চির সুন্দর দেবলোকের শাপভ্রষ্ট দেবতার মত কন্দর্পকান্তি পুরুষ—সে ভূপতি।

এমন সময়ে ভূপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল—"দেখুন, কালই কিন্তু আমাদের কাশী রওয়ানা হতে হবে। আমি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছি।" মাধুরীদেবী হাসিয়া কহিলেন—"আমরাত অচল পদার্থ—যখন যেদিকে টেনে নিবে, সেইদিকেই যাব।" ভূপতি হাসিয়া কহিল—"তবে ইলেকট্রিক্ ব্যাটারি কিন্তু আপনারা, ইঙ্গিতে আমরা উঠি বসি।" আজ নিরুপমা যেন মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না, আজ কোথা কোন্ অজানা দেশ হইতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে রাঙা বসনখানি পরাইয়া দিয়াছিল।

অনিল দেশে রীতিমত একটা বিদ্রোহ ঘটাইয়া তুলিয়াছিল। যে বংশের লোক কোনদিন সাধারণ ইতর শ্রেণীর সহিত মিশিত না, আজ কিনা সে বংশের দুলাল সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। সে ইতর শ্রেণীদিগকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত করিয়া—দেশীবস্ত্র ব্যবহার, মদ পরিত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিল। সে নিজে তাহাদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভূপতি যে মহৎ আদর্শ লইয়া গ্রামে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, অনিল তাহা পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। গ্রামের প্রাচীনেরা ব্যতীত যুবকেরা সকলেই তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিল।

এমন সময়ে অনাকাঙ্ক্ষিতরূপে ভূপতির নিকট হইতে একখানা সুদীর্ঘ চিঠি পাইল। চিঠিখানা কাশী হইতে লিখিত। এতদিন সে ভূপতির নিকট হইতে ও পিতার নিকট হইতে শুধু তাহাদের নিরাপদ পৌঁছান সংবাদটুকু পাইয়া আসিয়াছে, আজ এত বড় একখানা লেপাফা পাইয়া সে একটু বিস্মিত হইল। ভূপতি এই পত্রে অনেক কথাই লিখিয়াছিল—যে সব কথা হয়ত সে তাহার বন্ধু অনিলকেও সাক্ষাৎভাবে বলিতে পারিত না। ভূপতি নিরুপমার প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা বিবৃত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছে—"আমি অপরাধী কি নিরপরাধী

সে বিচার তুমি করিও। নিরুপমার দেহের ও মনের প্রতি আমি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি চাই, যদি তুমি অগ্রসর হও তাহা হইলেই আমি নিরুপমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারি, আমি কখনো চাহিনা যে নিরুপমা সমাজে কলঙ্কিনীরূপে পরিচিত হয়। সুবালা—সুবালাকে আমি জানি, সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার বিবাহে দুঃখিত হবে না, সে আমাকে ও নিরুপমাকে ক্ষমা করিয়া সাদরে বরণ করিয়াই লইবে। তোমার উপর আমি সব নির্ভর করিতেছি, যদি কর্ত্তব্য মনে কর, তবে তুমি এখানে চলিয়া আসিও—মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করিও না, নতুবা জানি না আমরা কি করিব। এখন কথাটা কোনমতেই প্রচার করিও না—সুবালাকে আমি বিবাহের পর সব কথা বলিলেও চলিবে।"

অনিল পত্রখানা পড়িয়া আনন্দিত হইল। এমনভাবে যে তাহাদের পরিবারের মধ্য হইতেই দেশে সমাজ-সংস্কারের একটা মহৎ আদর্শ প্রচারিত হইবে, সে আনন্দ তাহার প্রাণে একটা গভীর উত্তেজনা আনিয়া দিল। সে ভূপতিকে লিখিল—"আমি তোমার সৎসাহসের জন্য সহস্র ধন্যবাদ জানাইতেছি। নিরুপমা সমাজের চক্ষে বিধবা হইলেও—সে কুমারী। যে বালিকা একদিনের জন্যও স্বামী-সঙ্গ লাভ করে নাই, সে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানমতেই পতিতা হইতে পারে না। ব্যভিচারিণী হইয়া গুপ্ত পাপদ্বারা আত্মা ও দেহ কলুষিত করিয়া সমাজের চক্ষে পবিত্রা বলিয়া নিজ নিজ কন্যা ভগ্নীকে প্রচারিত

করিলে কখনও সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হইতে পারে না। ভূপতি! তুমি জান, যে নারী ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আপনাকে সারা-জীবন পবিত্র রাখিবার মত সাহস করে, আমি কোনদিনই তাহার বিরোধী নই, কিন্তু যেখানে যেটা সম্ভবপর নয়, সেখানে বিবাহই কি শ্রেয়ঃ নহে? সমাজ-সংস্কার—দেশের কল্যাণা-নুষ্ঠানের দিকে যতদিন না আমরা যুবক সম্প্রদায় অগ্রসর হইব, ততদিন আমরা মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা কখনও জাতিকে জাগ্রত ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিব না। আমি কোনরূপ ভণ্ডামিকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না। তুমি বাবার মতের জন্য ব্যস্ত হইও না, সে ব্যবস্থা আমি করিব। আমি এদিকের একটু কাজ সারিয়া যত তাড়াতাড়ি পারি—চলিয়া আসিতেছি। সুবালা ও খোকাবাবু, পিসীমা সব ভাল আছেন। আমি জানি তোমার স্ত্রী সাক্ষাৎ দেবী—তিনি আমার এই হতভাগিনী ভগিনীকে নিশ্চয়ই কোলে স্থান দিবেন। ইতি-তোমার অনিল।"

ভূপতি চিঠিখানা পাইয়া নিরুপমা ও মাধুরীদেবীকে দেখাইল। নিরুপমা শুধু একদিন এই কথাটি মাত্র ভূপতিকে বলিয়াছিল—"দেখ, স্ত্রীলোক সব অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারে, পারে না শুধু আপনার স্বামীর ভাগ দেওয়া।"

ভূপতি কহিল—'তুমি জাননা সুবালাকে—সুবালা মর্ত্ত্যের মানবী নয়, ত্রিদিবের দেবী।'

'তা হলে তুমি তাকে কি সব কথা জানাবে?'

"চিঠি লিখে তা হয় না নিরুপমা। বরং আমি অনিলকে তার

করে দিই—সে যেন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। লিখে দোব—আমার খুব ব্যারাম।"

"কেন তাকে চিন্তায় ফেল্‌বে ?"

'নতুবা উপায় কি ?' এদিকে নিরুপমার দেহে সন্তান সম্ভাবনা নারীর, অনেক লক্ষণই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছিল।

নিরুপমা আর কোন কথা বলিল না। এসব বিষয়ে সে এখন নির্ব্বাক্‌ই থাকিত। মাধুরীদেবী ও ভূপতি দুইজনেই পরামর্শ করিয়া সব করিতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই অনিল সুবালা ও খোকাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবালা সারাপথ পতির নানা অমঙ্গলাশঙ্কায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। কিন্তু বাসায় পঁহুছিয়া যখন স্বামীকে সুস্থ ও সবল দেখিতে পাইল তখন খোকাকে তাহার কোলে তুলিয়া দিয়া কহিল—"কেন, এমন করে নিয়ে এলে। উঃ কি মনের দুঃখেই না এসেছি! সারাপথ কেঁদে কেঁদে আমার কি যে যাতনা হয়েছে সে তোমায় কেমন করে বুঝাব। তোমরা পুরুষ মানুষ, নারীর বেদনা কি বুঝ্‌বে! এক্ষুণি পিসীমাকে তার করে দাও, তিনি যে কি ভাবে আছেন, সে কথা বলে বোঝান যায় না। ভূপতি পত্নীকে বুকে টানিয়া লইয়া ললাটে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল—সুবালা সব ভুলিল—তাহার হৃদয় পতিপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কি সৌভাগ্য তাহার—সে এমন স্বামিলাভ করিয়াছে। খোকাবাবু এদিকে নিরুপমার কোলে উঠিয়া সন্দেশের মিষ্টত্ব বিশেষরূপে

অনুভব করিয়া বলিতেছিল 'হ্যাঁ দেখ গো! মাসীমা—আমি ছন্দেশ বল ভালবাসি।'

১৮

অনিল যখন চৌধুরী মহাশয়কে আনুপূর্ব্বিক কাহিনীটুকু বুঝাইয়া কাশীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মত ব্যক্ত করিয়া কহিল, "বাবা! কলঙ্কের চেয়ে কি বিবাহ শ্রেয়ঃ নহে, তারপর এই সমাজ সংস্কার ত চিরদিনই আপনাদের মত শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরাই করে আসছেন। সমাজ সেত সিন্দুকের ভেতর—কয়েকটা টাকার তোড়ার ভেতর। তারপর এত আর নূতন নয়।"

মাধুরী দেবী বিদেশে সুযোগ পাইয়া স্বামীর উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামীকে তিনি সব কথা খোলাশা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। বিশেষ সম্ভ্রান্ত চৌধুরী মহাশয় গুরুজীর ঐ দুর্ঘটনার পর একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আপনার উপর আর আগের মত তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কহিলেন—"তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি আর কয়দিনই বা আছি, সে কটা দিন কাশীতে কাটিয়ে দোব।"

'তা কেন বাবা, কেন আপনার বিদেশে থাকতে হবে। সমাজের নেতা আপনি—আপনাকে সমাজ সম্বন্ধে কেউ কি কোন্ কথা বলতে সাহসী হবে?' "সে বাবা, তুমি আছ।

আমিও ভেবে দেখলুম, এ বেশ কথা। মেয়েটাকে সারা-জীবনের জন্য দগ্ধে পুড়ে নির্য্যাতন করা অপেক্ষা এ বিধান যে ভাল, বাবা, তাতে কোন সন্দেহ নেই—তোমার নূতনমাও সে কথাই বলছিলেন।"

"এত শাস্ত্রসঙ্গতই বাবা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ত হিন্দু-শাস্ত্র হতেই এ বিধান সঙ্কলন করেছিলেন।"

চৌধুরী মহাশয় এই ভাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলে অনিল কহিল—"বিবাহিত হ'ল, কিন্তু আপনার মেয়ে জামাই তাদের সম্মান বজায় রেখে চলতে পারে সে ব্যবস্থাও ত করা চাই।"

"আমি তা ভেবে সে ব্যবস্থাও করেছি, তোমার নূতনমা সব জানেন। অনিল পুলকিত হইয়া যাইয়া মাকে কহিল—"নূতনমা তুমি কি দেবী?" মাধুরী হাসিয়া কহিল—'আমি রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানবী।' তারপর অনিলকে চৌধুরী মহাশয়ের দানপত্র দেখাইয়া কহিল তিনি নিরুপমার জন্য এই বিধান করলেন। অনিল দেখিয়া বিস্মিত হইল যে তাহার পিতা ভূপতি ও নিরুপমাকে একলক্ষ টাকা নগদ এবং বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি দান করিয়াছেন। অনিল তাহার পিতার এইরূপ মহানুভবতা ও পরিবর্ত্তন যে মহীয়সী নারী দ্বারা সংসাধিত হইল, তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—"মা, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মত নারী যেন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হয়।"

১৯

ভূপতি সুবালাকে সব কথা কহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মাধুরীদেবীও সুবালাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। সুবালা নীরবে সমুদয় অবস্থা শুনিয়া কহিল—"তুমি আমার দেবতা, তার উপর আমি বরাবরই জানি যে নিরুপমাকে তুমি ভালবাস। তুমি যদি নিরুপমাকে অবহেলা করতে, তাকে এই সঙ্কট অবস্থায় ফেলে পালাতে, তাহলে আমি জীবনে অসম্ভব মর্ম্মযাতনা পেতুম। নিরুপমার সঙ্গে তোমার এই যে বিবাহ, এই বিবাহ প্রকৃত ধর্ম্ম সঙ্গত বিবাহ।" ভূপতি মুখ নত করিয়া কহিল—" আমি যে তোমার উপর অন্যায় করলুম, সে অন্যায়ের জন্য—"সুবালা বাধা দিয়া কহিল—"অন্যায়—কিসের অন্যায়? পূর্ব্বে যে একজন কুলীন একশত রমণীর পাণিগ্রহণ করতেন,—আর এত স্বাভাবিক কোন অন্যায় নয়, নিরুপমাকে আমার ছোট বোনটির মত দেখবো।"

নারী যে এমন করিয়া আপনার জীবনের সুখ, স্বার্থ বলি দিতে পারে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামান্ধ পুরুষ তাহা বুঝিতে পারে না। ভূপতি আনন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল—"তুমি—সুবালা—কি বলে আমি তোমাকে প্রশংসা করবো, তোমার এই ত্যাগ ও মহত্ত্ব আমাকে যে কতখানি মহৎ করে তুলছে সে আমি বলে বুঝাতে পারবো না।"

সুবালা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"তোমরা পুরুষ কি মনে কর, আমরা নারী সুধু একটা বিলাসের—ভোগের সামগ্রী প্রাণ-হীনা? তা নয়, নারী স্বামীর সুধু প্রণয়িনী নয়, শয্যাসঙ্গিনী নয়, সুখ-ভোগ বিলাসিনী নয়, সহধর্ম্মিণীও নয়, সে যে স্বামীর ইহলোকের ও পরলোকের **জীবন সঙ্গিনী**।"

এমন সময় মাধুরীদেবী নিরুপমার হাত ধরিয়া আনিয়া সেখানে প্রবেশ করিলেন। নিরুপমার কোলে খোকাবাবু বিরাম করিতেছিল। সে একটা পেয়ারা অর্দ্ধেকটা খাইয়া—বাঁ হাতে বাকী অংশটুকু ধরিয়া মাকে কহিল—"মা, মা, দেখ্ মা—এই যে আমাল লতুল মা।" ভূপতি নীরবে সে কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাধুরীদেবী নিরুপমাকে সুবালার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল—"ভাই আমি আমার এই দুঃখিনী মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলিয়া দিলাম, তার সব অপরাধ মার্জ্জনা করিও। এ অপরাধের বোঝা আমারই বেশী।" নিরুপমা মাথা নীচু করিয়া সুবালার পদধূলি গ্রহণ করিবামাত্রই সুবালা দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল—"বোন্, আমি তোমার বড়দিদি! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও, চিরায়ুষ্মতী হও। তুমিই যে আমার খোকার মা।"

এক শুভদিনে নিরুপমার সহিত ভূপতির বিবাহ হইয়া গেল। কাশীর বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে বড় সুখে ও শান্তিতে ভূপতি ও নিরুপমা এখন-ঘর

সংসার করিতেছে। সোণার সুবালা—খোকাকে নিরুপমার হাতে তুলিয়া দিয়া আজ দু'বৎসর হইল স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে পরপারে চলিয়া গিয়াছেন।

নিরুপমার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নিরুপমা নিজের সন্তান অপেক্ষাও সুবালার ছেলেকে অধিক ভালবাসে ও যত্ন করে। যখনই স্নেহপরায়ণা দিদির কথা তাহার মনে পড়ে তখনই স্বামী স্ত্রী দুইজনেই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে না। ভূপতি নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এখন প্রচুর ধনশালী হইয়াছে, কলিকাতা বালিগঞ্জে তাহার সুবৃহৎ বাড়ী একটী দর্শনীয় পদার্থ। ভূপতি সর্ব্বদা স্মরণ করে যে সুবালার ন্যায় মহিয়সী নারীর শুভ-কামনায়ই আজ তাহার এত উন্নতি ও পসার প্রতিপত্তি। সুবালার সুবৃহৎ তৈলচিত্রের সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া প্রার্থনা না করিয়া নিরুপমা কোন দিন সামান্য জলগ্রহণও করে না—তাহার কাছে সুবালাই জীবনের একমাত্র আরাধ্যা দেবী।

সম্পূর্ণ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই—

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই। আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়;—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়। পূর্ব্ব প্রকাশিতগুলি একত্র, বা পত্র লিখিয়া, সুবিধানুযায়ী, পৃথক্ পৃথকও লইতে পারেন।

ডাকবিভাগের নূতন নিয়মানুসারে মাশুলের হার বর্দ্ধিত হওয়ায়, গ্রাহকদিগের প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ৸৹ লাগিবে। অ-গ্রাহকদিগের ৸/৹ লাগিবে।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

১। **অভাগী** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। **পল্লীসমাজ** (ষষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। **দূর্ব্বাদল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

৮। **শাশ্বতভিখারী** (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৯। **বড়বাড়ী** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

১০। **অরক্ষণীয়া** (পঞ্চম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। **ময়ূখ** (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

১২। **সত্য ও মিথ্যা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

১৩। **রূপের বালাই**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়। (২য় সং)

১৪। **সোণার পদ্ম** (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। **লাইকা** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

১৬। **আলেয়া** (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

১৭। **বেগম সমরু** (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। **নকল পাঞ্জাবী** (৩য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯। **বিল্বদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (২য় সং)

২০। **হালদার বাড়ী**—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (২য় সং)

২১। **মধুপর্ক**—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

২২। **লীলার স্বপ্ন**—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।

২৩। **সুখের ঘর** (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ

২৪। **মধুমল্লী**—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। (২য় সং)

২৫। **রসির ডায়েরী**—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। **ফুলের তোড়া**—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। (২য় সং—যন্ত্রস্থ)

২৭। **ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস**—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২৮। **সীমন্তিনী**—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

২৯। **নব্য-বিজ্ঞান**—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ।

৩০। **নববর্ষের স্বপ্ন**—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। **নীলমাণিক**—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ।

৩২। **হিসাব নিকাশ**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি-এল্।

৩৩। **মায়ের প্রসাদ**—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩৪। **ইংরাজী কাব্যকথা**—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

৩৫। **জলছবি**—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৬। **শয়তানের দান**—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

৩৭। **ব্রাহ্মণ পরিবার**—(২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৩৮। **পথে-বিপথে**—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই।

৩৯। **হরিশ ভাণ্ডারী** (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৪০। **কোন্ পথে**—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম-এ।

৪১। **পরিণাম**—শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ।

৪২। **পল্লীরাণী**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৪৩। **ভবানী**—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু।

৪৪। **অমিয় উৎস**—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৪৭ দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল।

৪৮ ছবি—(২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪৯ মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।

৫০ সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

৫১। নাচ্‌ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।

৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

৫৩। ইহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪। দেওয়ানজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

৫৫। বাঙ্গালের ঠাকুর—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

৫৬। গৃহদেবী—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

৫৭। ক্ষোবতী—শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

৫৮। বোঝা পড়া—শ্রীনরেন্দ্র দেব।

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা।

৬১। গৃহ-কল্যাণী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

৬২। সুরের হাওয়া—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্‌ সি।

৬৩। প্রতিভা—বরদাকান্ত সেনগুপ্ত।

৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি-এল।

৬৫। লেডী ডাক্তার—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ।

৬৬। [illegible]ধীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি।

৬৭। চতুর্ব্বেদ—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন।

৬৮। মাতৃহীন—শ্রীইন্দিরা দেবী।

৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি এল।

৭২। জীবন সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা